KALIKATA LITTLE MAGAZINE LIBRARY-O-GABESHANA KENDRA
18/M TAMER LANE, KOLKATA-700009

Record No. : KLMLGK 2007/	Place of Publication : ৮ [illegible] ৯৩ লেন, কল-৮
Collection : KLMLGK	Publisher : মিহির দেব (5/2) / প্রীতি মুখোপাধ্যায় (6)
Title : অনার্য সাহিত্য (ANARJYO SAHITYA)	Size : 8.5"/5.5"
Vol. & Number : 5/2 6 8 9	Year of Publication : Oct - 1986 Jan - 1987 Jan - 1988 Nov - 1988 Condition : Brittle / Good ✓
Editor : প্রীতি মুখোপাধ্যায়	Remarks :

C.D. Roll No. : KLMLGK

শ্রীধর মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত

অনার্য সাহিত্য

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী, ১৯৮৭

'The World
is your exercise-book, the pages
on which you do your sums.
It is not reality,
although you can express reality
there if you wish.

You are also
free to write nonsense,
or lies, or to tear
the pages.

অনার্য সাহিত্য

কলকাতা বইমেলা, জানুয়ারী ১৯৮৭

কনটেম্পোরারি রাইটার্স সিরিজ

পাসিং লাইটস / ১

- ☐ শুভব্রত চক্রবর্তী
- ☐ তাপস চক্রবর্তী
- ☐ মণীশ সিংহরায়
- ☐ শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

কবি স্বাধীন তখনই যখন তার চিন্তা, চেতনা, বোধ ও বিশ্লেষণ প্রভাবহীন এবং নিজস্ব আলোয় সে প্রকাশিত। এই দশকে কবিতার কাছে আত্মসমর্পিত কয়েকজন তরুণের সামনে প্রধান সমস্যা এখন একটাই : তপস্যাভংগের বিবিধ আয়োজন ব্যর্থ করা এবং সংভাবে অনুভূতিকে প্রকাশ করা।

এবং এই কবিরা নিজেদের নিষ্ঠা ও সততায় বিশ্বাসী বলেই অন্য কারো সাহায্যের, কোন আবাদিনের প্রদীপের তোয়াক্কা করে না। যদি প্রকৃত অর্থেই তাদের লেখার ও চিন্তার দার্শনিক বা আদর্শগত বিন্দুসমূহ পৃথিবীর কাছে প্রাসঙ্গিক মনে হয় তবেই তাদের লেখার সার্থকতা। কমিটমেন্টের কথাটা এভাবেই বলা ভাল। যদি আগামী সময় তাদের চিন্তাকে গুরুত্বহীন প্রমাণ করে তাতেও ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। কারণ এইসব কবিরা শুরুই করেছেন শূণ্য থেকে। এবং আজ যে আর পোয়েট প্রফেট্ হয় না তা তারা আগেই জেনেছেন।

এইসব কবিদের উচ্চাশা একটাই আজীবন সংভাবে, অনুগ্রহ ও দয়া মুক্ত হোয়ে লিখে যাওয়া।
এই বিক্ষত সময়ে তাদের প্রতিটি জীবন্ত, বাস্তব অনুভূতি তারা গ্রথিত করতে চান তাদের লেখায়।

না, কবিতা লিখে দারিদ্র দূর করা যায় না।

কবিতা লিখে অসাম্য নষ্ট করা যায় না।
কবিতা লিখে যুদ্ধ থামানো যায় না।
এবং যেকোনো মুহূর্তেই ধ্বংস হোতে পারে পৃথিবী।
হ্যাঁ। এখানেই কবিতার নিঃসঙ্গ দর্পিত অবস্থান।
এজন্যই কবিতা এক অতীন্দ্রিয় প্রার্থনা, চিরকাল।

এখনো উজ্জ্বল আকাশ ও রোদ্দুর দেখলে মানুষের মধ্যে শুরু হয় উৎসব। আর যতদিন মানুষ স্বপ্ন দেখবে, যতদিন মানুষ ভালবাসবে ততদিন কবিতা থাকবে। কবিতা থাকবে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে অপেক্ষার সময়ে, কবিতা থাকবে শেষতম চিতায়, কবিতা থাকবে ভীষণ ধ্বংসের রাত্রি ও সৃষ্টির প্রভাতে।

যে কবিতার সৃষ্টি বেদের ঋষির কণ্ঠে সেই কবিতা আগামী আরও অযুত বছর। সেই চরাচর বিস্তৃত ভালবাসার অরণ্যে নির্লিপ্ত ভাবে আরও কয়েকটি উদ্ভিদ আমরা রোপণ করছি। শুধু এইটুকু।

আশি দশকের স্বাধীন লেখকদের নিয়ে যে 'কনটেপপোরারী রাইটার্স সিরিজ' আমরা শুরু করছি এটি তার প্রথম সংকলন। পরপর আমরা এইধরণের কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশের আশা রাখি।

শুভব্রত চক্রবর্তী

তাকে অক্রমণ করতে ভয় পায় বিষাদ, হতাশা ও ক্ষয়। ঋজু, তীক্ষ্ণ ধীশক্তি-সম্পন্ন এবং উদাসীন। অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি-এগুলো কবির পক্ষে অস্বাস্থকর বলে তিনি মনে করেন। 'আজকের যুগে যীশু জন্মগ্রহণ করলে তাকে শতগুণ বেশি ক্ষমতাসম্পন্ন হোতে হত। এবং আবেগসর্বস্ব সৃষ্টি শিল্প নয়। শিল্প বলে গ্রাহ্য নয় তাও যা বিজ্ঞানহীন হিরন্ময় রহস্যময়তা' শুভব্রত এ কথাগুলো বলার সময় বিন্দুমাত্র উত্তেজিত হন না। কারো প্রতি ক্ষোভ বা ঘৃণাও নেই তার। কিন্তু যা লঘু ও চপল তাকে তিনি স্বীকার করেন না। অনুভব করি তার মধ্যে সত্যের ও বিশ্বাসের উপলব্ধিগুলো স্বকীয় ও দৃঢ়। তার কথা এরকম 'ভালো লেখার অভাব চিরকাল, আমরাও কেউ মহৎ কিছু সৃষ্টি করতে পারছিনা। সুতরাং আমাদের প্রথম ও একমাত্র কাজ ভালো লেখার চেষ্টা করা।

আপনি শুভব্রতকে সমস্ত বড় ও প্রভাবসম্পন্ন কবিদের সঙ্গে আড্ডা মারতে, আলোচনা করতে দেখবেন। কিন্তু দেখতে পাবেন না বড় কাগজে তার কোন লেখা। বলেন না, আমরা বুঝি আত্মসম্মানবোধ ও রুচি তার মধ্যে কত তীব্রভাবে কাজ করে। তাই প্রদেয় সম্মান ব্যাতিরেকে তার কাছ থেকে লেখা পাওয়া 'আনন্দ-বাজার' 'অনার্য সাহিত্যের' পক্ষে একই রকম অসম্ভব। চূড়ান্ত ভদ্র, শান্ত এই যুবক সৃষ্টির ব্যাপারে তপস্যায় বিশ্বাসী হলেও কোনরকম আন্দোলন বা উত্তেজনায় অবিশ্বাসী 'বরং আমরা anti-revolution করব। যুদ্ধ, শান্তি, বিপ্লব, কমিটমেন্ট এসব concept সময়ের সঙ্গে অতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে।' তিনি স্বাভাবিক গলায় বলেন।

শুভব্রত প্রধানতঃ কবিতা লেখেন। তাঁর কবিতার ব্যক্তি মানুষের জীবনযাপনের সংবর্ত বিস্ময়, রহস্যময়তা, আনন্দ কাজ করে। তিনি ঈশ্বর বিশ্বাসী নন, প্রচলিতঅর্থে তবু তার কবিতায় এক তুষারশুভ্র জ্যোতিময় পুরুষের ছবি আসে নানা দৃষ্টিকোন ও অনুসঙ্গ থেকে। বোঝা যায় তিনি এক চরম বিন্দুতে আকৃষ্ট হন যেখানে পৌছনোর পথ বহু লতাগুল্মে অধ্যুষিত। আক্ষেপ, অপ্রাপ্তির জ্বালা তার লেখার উল্লেখযোগ্য ভাবে কম। বরং তিনি মুগ্ধ, চাওয়া-পাওয়ার সমীকরণ টিকে সরিয়ে রেখে তৃপ্ত। এ প্রসঙ্গে 'মোনালিসা' ছবিটিকে তুলনা সংস্কার ও অভ্যাস বাদ দিয়ে রাখা যায়।

শুভব্রতর জন্ম ১৯৫৮। সেন্ট জেভিয়ার্সের গ্রাজুয়েট। চাকরী করেন না ব্যবসাও না, কয়েকটি টিউশনি করেন। 'পঁচিশে বৈশাখের কবিতার' সম্পাদক। বন্ধু ও সুহৃদদের বহু অনুরোধ স্বত্বেও এখনও অবধি কোন বই প্রকাশ করেননি। 'অহংকারী আটজন' নামে একটি সংকলনে তার কয়েকটি কবিতা স্থান পেয়েছে অবশ্য। ভারতীয় ক্লাসিকাল সংগীতের সাধু শ্রোতা। নিয়মতান্ত্রিক প্রেম নেই। বার্নার্ডশ, ব্যার্টাণ্ড রাসেল, চারমিনার সিগারেট-এ শ্রদ্ধা আছে।

প্রসঙ্গত: শুভব্রত প্রায় নিয়মিত ছবি আঁকেন এবং তার নিজস্বতার প্রমাণ বর্তমান।

তাঁর সাম্প্রতিক কবিতার মধ্যে 'ব্যক্তিগত গৃহযুদ্ধ' একটি উল্লেখযোগ্য সিরিজ।

ব্যক্তিগত গৃহযুদ্ধ / ১৬

নিঃসঙ্গ টিলাগুলো পার হোয়ে আমি হেঁটে গেছি রক্ত খচিত বন্দরের দিকে।
সামনে বিস্তৃত অলঙ্ঘণ রেখা, চকিতে হাত বাড়ালে অরণ্যের প্রাচীন সঙ্গীতে শব্দ
ওঠে ঘন কালো বৃষ্টিপাতের। তখনও স্পষ্ট নয় মিনারের ঝাপ্‌সা আলো।
উপবাসের সেই জলে মুখ লুকিয়ে কাদামাখা অচ্ছুত চাঁদ আরও হীনগণ্য কোরে
তোলে আমায়; কবন্ধের মতো কখনো বা বিষণ্ন। আমি স্তব্ধ কারুকাজে বাধা
পৈতৃক খাটের নিচে আগুন জালিয়ে দেখেছি সেখানেও ফিরে গ্যাছে উপবনের
বিবস্ত্র রাত্রি।

ব্যক্তিগত গৃহযুদ্ধ / ১৭

তোমার ব্যক্তিগত রাত্রির মুখে আমার নিঃশ্বাসের ঘূর্নিমান আগুন ক্রমশ বিষাদময়
অথচ এই আমি অরণ্য উৎসবের দিনে রক্ত, ক্লেদ আর হলুদ শুক্রাণু ছড়িয়ে এসেছি
ফিরে যাওয়ার সমস্ত পথে। সে কি ভ্রম মাত্র—নাকি জাতকের শূন্য থালায়
দেখতে চেয়েছিলাম মেঘেদের স্বর্ণ কান্তির যদি ফিরে আসো, সহজেই চিনে নেবে
উপত্যকার সঠিক সরণি। এখন আরও দূরে আরও নিজস্ব বলয়ে তুমি প্রকট
হোলে আমি ধীরে বিষন্ন কুয়াশা ঢাকা নৈশ ভোজের টেবিলে গিয়ে বসি।

ব্যক্তিগত গৃহযুদ্ধ / ১৮

অভিযাত্রীদের থেকে আমি ক্রমশ পিছিয়ে পড়তে থাকি, অন্ধকারে; এবং গন্তব্য
আরও নিকট হোলে
মেঘেদের লতাগুল্মজাল আচ্ছন্ন কোরে দেয় সমস্ত গিরিপথ।
আমি মন্দাক্রান্তা ঢেউ-এর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে
অনায়াসে ফিরিয়ে দিই শুভ্র পরমান্ন—
যখন আনন্দ ভোজে আবার ছাখা হোয়ে যায়, আমি আমার
পোশির উৎকৃষ্ট মাংস সাজিয়ে দিই বোধিবৃক্ষের তলায়
নির্জনতার গান শুনি—আশ্চর্য তার ক্ষতবিক্ষত শরীর;
সেই সব রক্তলোভী
নিশাচর, বৃক্ষ পতঙ্গদের সংগে আমি আরও কিছুকাল অপেক্ষায় থাকবো।

ব্যক্তিগত গৃহযুদ্ধ / ১৯

আমার গৃহের অন্দর মহলে যাদের যাওয়া আসা আছে, সেই সব অতিথিদের
অনেকের সম্বন্ধেই আমি প্রায় কিছুই জানিনা। তাই যখন তাদের মধ্যে কেউ
কেউ মতাল হোয়ে আমার পারস্য থেকে আনা কার্পেটে ঘৃণায় বমি করে দেয়
আর আমার রক্ষিতার ওপর ভীষণ অত্যাচারী হয়ে ওঠে তখনই সুন্দর পোশাকের
নিচে দাহাময় বারুদ কারখানা। আমি চাই না এই সব রুপোলী সন্ধ্যারা চরাচরে
ছড়াক মিথ্যাচার এবং কুয়াশা; যা অন্ধকারের মধ্যে কাপুরুষের জঘন্য মুদ্রাগুলোকে
আরও বেশি হাস্যস্পদ কোরে তুলুক। আর সাহসী যুদ্ধবাজেরা কিছুটা শ্রান্ত
হোলে এই আমি ঢেলে দি জ্যোৎস্না উত্তপ্ত চুল্লীর নীচে।

ব্যক্তিগত গৃহযুদ্ধ / ২০

আমার দীর্ঘ পদযাত্রার পর তীর্থের আলোগুলো হোয়ে ওঠে আরও বেশি কঠিন
এবং রক্তাভ। কোনো মাংসলোভী নিশাচরের হস্তক্ষেপে সরণির উচ্ছৃঙ্খলা
বিচারাধীন। আমি গণ্ডিবদ্ধ সীতার কাছে নির্যাতনকামী। তাই রাত্রির
উপাসনায় ওঠে চর্বিগৃহের হুঙ্কার। অসফল তারারা বর্বর হোতে হোতে ক্রমশ
ঢুকে পড়ে বিষাদের কালো কার্বনে। চলে যাও তুমি, আমি একাই বুকের লোমে
বেঁধে রাখবো আকাশের অন্ধ পালক।
দগদগে ঘায়ে বৃষ্টির পোকাদের নাচ এখন কোনো অলৌকিক বিলাস নয়; সেই
নীল ধোঁয়ায় দ্বীপ, শুধু সত্য। যাকে করতলে পেলে কঙ্কাল শৃঙ্গের উপর উড়িয়ে
দেবো তেজস্ক্রীয়হীন বিবর্ণ, সাদা পতাকা।

ব্যক্তিগত গৃহযুদ্ধ / ২১

যুদ্ধজয়ের পর সারারাত আগুনের পাশে রেখেছিলো তার
প্রেমের শরীর; শুদ্ধ বাষ্পে ক্রমশ
হারিয়ে যেতে থাকে আঘাতের রক্তিম ক্ষতগুলো।
অথচ কিছুখন আগেও সেইসব আসক্ত তরল বিন্দুরা
নারী ও ঘুরার দিকে ছুটিয়ে দিয়েছিল তাদের
সবচেয়ে দ্রুতগামী আশ্বযান
আমার কপালে চন্দন চর্চিত
ভেজা বারুদকুচি
কিছু বিষন্নতায় লোকভয়ে অধর্মের পাপসংকীর্তনে, আর
জ্যোৎস্নার বিকিরণে সেই আত্মম্বরীতা ছড়িয়ে পড়ে
সম্মুখে, সমস্ত শিষ্ট জনতার মধ্যে।

ব্যক্তিগত গদ্য

৭

এই রাত্রি কি তবে বিফলে যাবে! একটানা বমির পর মুখের ভীতরটা বিষাদ। সবাই ঘুমিয়ে পড়লে আমি বেরিয়ে এসে গেষ্ট হাউসের বারান্দায় দাঁড়াই। ঠিক, ঠিক এই সময় হয়ত আমার প্রীয় বন্ধুরা পার্কষ্ট্রীটের কোনো সরাই-এ, কিঞ্চিত মেদ-যুক্ত গোলাপী কিংবা নীল পৃথিবীকে সামনে রেখে নেশায় সম্পৃক্ত। ওদের সাথে আমিও থাকতাম, ষোড়শ শতাব্দীর কোনো বীরপুরুষ যুবক সদ্য দ্বন্দ্বযুদ্ধে জিতে তার প্রেমিকার স্বস্থ পান কোরছে। কিন্তু না, এই অরণ্য, ধূসর জ্যোৎস্না আমাকে টেনে নিচ্ছে অভ্যন্তরে ·····অন্য কোথাও ·····

আমার চোখ ঘোলাটে, বিপথগামী জ্যোৎস্নার নেশায়। গেস্ট হাউসের পিছনে মেহন্দির শরীর থেকে উঠে আসছে বিষন্নতার ঘ্রাণ। অন্ধকারে আমি চিৎকার করে উঠতে চাই, সেই সব ভ্রষ্ট যোগিনীদের জন্য·····'আয়, নেমে আয়, নেমে আয় তোরা'··· লোলুপদৃষ্টিতে চেটে নেবে সমস্ত কার্বণের শহর। কারন তোমাদের উল্লাসে আমি ক্রমশ ভীত।

কোনো দার্শনিকের তুকতাক স্পর্শ করবে না বুকের ফসিল ডিম। আমি ঘর থেকে আর এক পেগ বানিয়ে চলে আসি রেল লাইনের ধারে। বহুদিন আগে চলন্ত ট্রেন চলে গ্যাছে শরীরের উপর দিয়ে, এখনও সেই অবিকৃত লাশেরা কুরে কুরে খাচ্ছে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতিমালা। রাত্রির কোন বিশেষ মুদ্রা নেই। শুধু গেলাসের ভিতর থেকে উঠে আসা অজস্র বুদবুদ্ পৃথিবীতে চিরস্থায়ী হয়ে উঠবে আমার এই মুহূর্তগুলোর সঙ্গে।

১৩

কিছু রক্ত, পুজ আর জলে, হাড়ের মালাগাথা এই শরীরে আমি আশ্রয় দিয়েছি অজস্র সাদা পোকাদের। কোনো ইন্দ্রীয়পুষ্ট শপথের সপক্ষে আমার এই আদিম দামামা ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠছে। আমি জানি নিছক কৌতুহল নিয়ে মরুভূমির পথে বেশিদূর হাঁটা যায় না। একদিন শ্মশানের উতপ্ত হাওয়া ভর করে উঠে যাব ইথার স্তরে···

তবু আমরা নিজস্ব সুস্থতাকে খুঁজি; এবং এইভাবে একদিন পৌছে যাই একে-

একে পাকস্থলীর অন্ধ কুঠরীতে। সাদা ফেনা আর চিত্তাকর্ষক রঙীন ওষুদ কারখানার চুল্লীতে পুড়ে ছাই হচ্ছে আমাদের রুপোলী পোষাক। গভীর রাতে মেধার অসহায় ক্রন্দনে ঘুম ভেঙ্গে যায়।

'Health is a state of **Complete** physical, mental and social well-being and not merely the the **Absence** of disease or infirmity'.

আমার অমৃতের শিশুরা গৌরঙ্গির অন্ধ গলিতে চন্দনের সুবাস ছড়াবে এই আশায় আমি বেশ্যাপল্লীতে সাজিয়ে দিয়ে আসি বারুদের ঘর। আমার কোটের পকেটের ছাড়পত্র আমাকে চিহ্নিত কোরে দেয়···হ্যা আমিই আদিম পুরুষ, সমস্ত শিশুর জনক, গুহার চিত্র, ভোঁতা প্রস্তর অস্ত্র দিয়ে লড়াই করছি কোনো ম্যামথের সঙ্গে। ডালহাউসি স্কোয়ার থেকে শনিবার আমরা হাঁটতে থাকি খালাসিটোলার দিকে। শীতের বিকালে প্রতিক্ষার এই দীর্ঘ পথ মদের গ্লাস হাতে উঠবার আগেই আমাদের মাতাল কোরে দেয়। কামনার তীব্র নীল বিষ; হাজার হাজার প্রজাপতি মেখে নিচ্ছে বিকালের হলুদ রেণু। আমার উত্তাপের জন্য হাসপাতালে অপেক্ষা করে আছে এক লক্ষ প্রসুতি ও তাদের বিকলাঙ্গ শিশুরা! তোমরা কেউ এসো····· আমাকে চিনিয়ে দিয়ে যাও পথ ···আমি ঠিক খুলে দেবো হাসপাতালের কালো দরজা···একদিন ·····অবহেলায়·····

লেক প্লেসের বাড়িতে আজ অজয় চক্রবর্তী এক অপূর্ব সন্ধ্যা আমাদের উপহার দিলেন। তার সংগে কিছুটা জিন। ফিরে আসার পথে লেকের মধ্যে নিজেকে চিনে নিতে কোনো কষ্ট হয় না। ঝমঝম করে মেধায় ভেসে যাচ্ছে রঙীন তরঙ্গ আর এই বিচলিত পাদুটো আর আমার নিয়ন্ত্রাধিনে নেই; নিয়তি এই, সমস্ত স্বত্ত্বার মধ্যে লোভের বহু চোখ আমাকে আড়াল কোরে দেয়।

আমি তোমার কয়েক মুহূর্তর জন্য, ত্যাগ করতে পারি সমস্ত উত্তেজক। হয়ত উচিত নয়। রাত্রিতে আমি ইতু তোমাকেই কামনা করি। তুমি ভালোবাসো গান—আমি তোমাকে

I long to talk with some old lovers' ghost, who died before the god of love was born;

মনে পড়ে সেই সুবর্নরেখার কথা, ডাকবাংলো বালির পাড় আর অবিশ্রান্ত বৃষ্টির রাত। আমাকে তোমার এই সব ঘটনা ক্ষণকালের জন্যে সুস্থ করে তোলে।

ভুলে যাই বাবা—মা— বন্ধুদের এবং তোমাকেও। অন্ধকার গুহা থেকে বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছি চৌকো সবুজ কনফেসান বক্সের মধ্যে—সংস্কার শূন্য—"Repent and ye shall be forgiven."

১৭

সন্ধ্যার মুখোমুখি রাস্তার দুপাশে সারিসারি দোকানের বিজ্ঞাপিত কাচের জানলা। স্পষ্ট ল্যাম্পের তলায় বর্ণময় বিপনি। সেখানে শীতের ফাটা গোড়ালীর রক্ত চেটে নিচ্ছে অন্ধকারের শ্বাপদ শিশু; কুয়াশার মধ্যে তার ঘায়ের গোলাপী আভা চারপাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে উত্তাপ এবং একই সঙ্গে শিলাচরের অখণ্ড শ্রান্তি। এই বৈষম্যে হেসে উঠেছিলো রাত্রির আকাশ। তার ঘন কালো চুল উড়িয়ে, উল্লাসে এসে দাঁড়ায় কোনো গৃহস্তের দরজায়, কড়া নাড়ে

কে…

কে এই আদিম তরঙ্গে…

অন্ধকারে, আলোয়, মহাশূন্যে…

আছে·· উত্তর আছে…কঠিন উত্তর, অথবা নেই।

তবুও সংস্কার, গ্লানী, ব্যাধি, ক্রোধ. লিপ্সা, কামে সাজিয়ে রেখেছি উজ্জ্বল পানশালা।

বাউলের নিষ্কৃতি আমার মধ্যে নেই। বাবাকে আমি কখনো খুনীর জায়গায় রেখেছি। মাকে দেবীর ভূমিকায়। তোমরা ক্ষমা করো।

পার্ক লেনের সেই বাড়িটার হাজার রূপসীর অভিনয়ে আমার যৌবন। স্বচ্ছ শিশিরের মত পারিপার্শ্বিক ঘটনায় বাধা এ জীবন; আজও রক্তের মধ্যে মহাশ্মশানের শূন্যতা। আমি ইতুকে গঙ্গার ধারে বসিয়ে স্মৃতি থেকে অনেক গল্প বলেছি। শুধুই গল্প

'This is what fools people : a man is always a teller of tales, he lives surrounded by his stories and the stories of others, he sees everything that happens to him through them ; and he tries to live his life as if he was recounting it.'

সামনে সমুদ্রের অন্ধকার। রঙচঙে ফানুসের মধ্যে নিজেকে সাজিয়ে রাখি। ইতু···সোনালী ইতু তোমাকে আমার গল্পের ভিতর নিয়ে আসি। তৈরি হয় সেতু; পুনর্বার। কাফ্‌কার ডাইরি থেকে তোমাকে অনেক উদ্ধৃতি শুনিয়েছি;

উপহার দিয়েছি সেজানের ছবি। আমার কবিতার দীর্ঘ পংক্তি তোমাকে বারবার বিরক্ত করেছে। সাদা বিছানার উপর তোমার শরীর। আমি কি করবো? খোলা জানলা দিয়ে বাইরে তাকাই। বাইরে রূপোলী জ্যোৎস্না আর ঘরের মধ্যে গাছের ভেজা গন্ধ। দুহাত শূন্যে তুলে দিয়ে আমি নক্ষত্রদের দিকে স্থির—পাঁজারে বেজে ওঠে অজস্র জলতরঙ্গের সুর

'But you have to choose ; to live or to recount'

বায়ুর ভিতর ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে 'oxygen'. তাই বৃক্ষরোপন দরকার। কালো গাছগুলো তাদের বিশাল শরীর ছড়িয়ে আমাদের আশ্রয় দিচ্ছে নানা ভাবে। আমার বারান্দায় আমি একটা ক্রিসানথিমামের চারা পুতেছি। ছোট্ট গাছটা আমাকে শেখায় কি ভাবে বেচে থাকতে হবে। আমি তার কাছ থেকে অক্সিজেন ধার করে নিই। একদিন ফিরিয়ে দেবো সমস্ত ঋণ।

রাস্তায় মিছিল। জনতার হাতে দুলে ওঠে অধিকারের পোষ্টার। বাড়িতে কেউ না থাকলে আমি তোমায় চিলেকোঠার ঘরে নিয়ে আসি। তোমার বুকে হাত রেখে প্রতিজ্ঞা করি কখনো ওদের সংগে মিশবো না।

মিছিলের বন্ধুদের থেকে আমি দূরে থাকি। তারা আমায় অনেক কিছু বলে। আমি বুঝি না; চরৈবেতী আমি তাদের নিয়ে যেতে চাই পার্ক লেনের সেই বাড়িটায়। যেখানে হাজার রূপোসী আজও আমার রক্তের মধ্যে ফুটিয়ে তুলছে অজস্র হলুদ ফুল।

(ক) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে যখন প্যারিসের রাস্তায় প্রচণ্ড তুষার পাতে নষ্ট হয় পিচের মসৃণতা, আমি ফিরে এসেছিলাম এই ফলতায়। মধ্যরাতে বিমানবন্দের নিস্তব্ধতা আমাকে জানিয়ে দেয় একসময়ের সুতানটী আজ কর্মকাণ্ডের বিশাল শহর। তবুও বিষণ্ণ। বিমানবন্দরের সামনে দাড়িয়ে আমি তার দুঃখে কেঁদেছিলাম কিছুক্ষণ (I love you my beloved city…তোমার পাজরে পাজরে যে শব্দ,·· আমার হৃদপিণ্ডের।) এখনকার কবিরা বড় বিষাদময়, দুঃখী। পিঠে সমস্ত আকাঙ্খার বোঝা; হাত পা ছুঁড়ে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়। কবিতার জন্য ধারালো গিলোটিনে মাথা পেতে আছি। কখনো কি লেখা হবে সেই একমাত্র কবিতা? একুশ বছর ধরে সামরিক শিক্ষার মধ্যে কবি উঠে আসবেন তার চিতায়·· শেষ পৃথিবীতে

কোনো বিদেশী মদের দোকানে আমার বন্ধুরা আমাকে নিয়ে ব্যঙ্গ করলে, আমি

মদের গেলাসে চুমুক দিই। ভুলে যাই আত্মগ্লানী…'আমার আত্মহত্যার জন্য কেউ দায়ী নয়'।

(খ) তোমরা ভাঙিয়ে দাও প্রশংসা অথবা নিন্দায়…ক্ষনকালের জন্যেও চুপ করে থেকো না।

২১

আমি আমার সামাজিক বৃত্তিগুলোকে এখন খুব সাবধানে দূরে সরিয়ে রেখেছি। অনুসরণ করি জলের কর্দমাক্ত পোকাদের।

তুমি ত আবেগহীন ; কাম, লোভ, দুর্বলতা, স্পৃহা, ব্যভিচার, লাম্পট্য কখনো তোমাকে স্পর্শ করেনি। সাজিয়ে রাখোনি মাংস কারখানায়। কেননা মহা শূন্যের প্রপাতের নিচে তোমার স্থবির অবস্থানের কথা আমরা জানি। নিষ্কৃতির পথে আমরাই সেই অনন্ত ঘুম ভাঙিয়ে দিয়েছি। টেনে এনেছি চর্বিঘরের মধ্যে। এখন তুমিই আমার ইতুর ঘন কালো চুলের প্রধান সাক্ষী…একই সংগে অন্ধকারে মুখ লুকাই……

'দেহবুদ্ধ্যা দাসোহস্মি জীববুদ্ধ্যা ত্বদংশকঃ।
আত্মবুদ্ধ্যা ত্বমেকহং হতিমে নিশ্চিতামতিঃ।'

ভালো লাগে না! তবুও আমাকে যেতে হয় কবিতার আড্ডায়, কফিঘরে, মদের টেবিলে। স্নায়বিক ধারালো অস্ত্রের ব্যবেহার ঈশ্বরের পোশাকে রক্তের মানচিত্র। ইতু তোমাকে হয়ত কাল রাত্রির মতন আর পাব না কখনো……

সৌন্দর্যকেও নয়……

ঈশ্বরকেও নয়……

এই ভালো। আমার আত্মগ্লানী ক্ষয়ে পথ আরও পিচ্ছিল করে তুলুক।

অর্থের বড় টানাটানি চলছে। আমি শূন্য ব্যাগ ছুড়ে দিই কদর্য বেশ্যাদের পায়ের তলায়। কিন্তু ততদিনে তারা আমায় ভুলে গ্যাছে। আমি হাঁটতে হাঁটতে চলে আসি অন্ধ গলিটার মুখে। দেশোয়ালী গানের আড্ডায় গিয়ে বসি। হাতে তুলে দেয় তাড়ির গ্লাস। এই অমৃত পানের পর আমার পুনর্জন্ম

এবং পিকাসোর নীল সময়ের…
এবং দেঁগার বিবস্ত্র নারীদের…
এবং যীশুর…

কাল রাত অব্দি আমার ঋণের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ১৫ কোটি ডলার। পাঁচ কোটি বছর পরে কোন উত্তরপুরুষ অর্থনীতির এই পাথরের তলায় ফসিল হয়ে থাকবে।

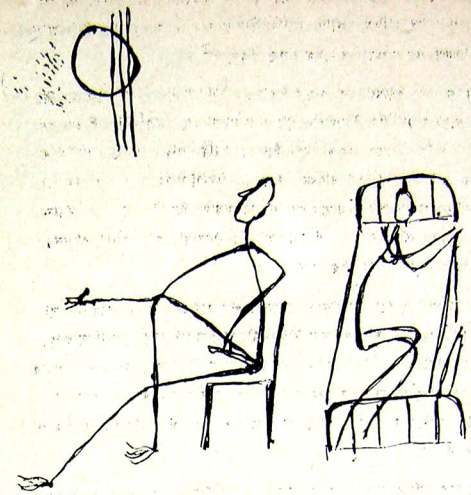

তাপস চক্রবর্তী

আমাদের সময়ের সবচেয়ে আলোচিত, বিতর্কিত, ও পরিচিত কবি তাপস চক্রবর্তী। ব্যবসায়িক কাগজে একটি শব্দও না ছেপে তিনি যে প্রচার ও গুরুত্ব পেয়েছেন তা অপূর্ব। বস্তুত 'আশি দশক' কথাটি বলা মাত্রই যার নাম প্রথম মনে পড়ে তিনি তাপস। তাঁর উৎসাহ, সাহস ও দৃঢ়তাই 'আশি দশক' নিয়ে আজ যে আলোচনা তা সৃষ্টি করাতে সক্ষম হয়েছিল। তার সম্পাদিত 'কলকাতার হ্যামলেট' এই সময়ের তরুণদের প্রতিবাদ, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও মাথা তুলে দাঁড়াবার প্রথম ভূমি।

সম্পাদক তাপস, না এই সময়ের কবিতার প্রতিনিধি তাপস একজন আদর্শ কবি-চেহারার রাগী, সচেতন, রুঢ়, শক্তিমান মানুষ। এবং তিনি স্পষ্টভাষায় যার জন্য বাংলা সাহিত্যের চিরাচরিত চোর ও মেকী বিপ্লবীরা তাকে পরিহার করতে চান। যখন ক্রীতদাস হওয়ার অবদমিত কামনা ও প্রচেষ্টা বহু তরুণ কবিদের শরীরে

গলিত ক্ষতের মত দৃশ্যমান তখন তাপস এক অনন্য ব্যতিক্রমই শুধু নন অতি প্রকাশ্য তীব্র সমালোচক চলতি সাহিত্যরীতির। যদিও তিনি শ্রদ্ধা করেন একজন বিক্রয় হয়ে যাওয়া লেখকেরও শুদ্ধ সুন্দর সৃষ্টিকে।

কবি তাপস এই সময়ের এক জলন্ত দর্শক। তিনি সস্তা রংচঙে মোড়কের নিচে সভ্যতার প্রাগ্‌ঐতিহাসিক সরীসৃপের ঘৃণ্য অবস্থানকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করেন তার লেখায়। তিনি জানেন 'অদৃশ্য ছায়া কাঁপে ; আদি পৈতৃক উঠোনে, সংখ্যাতত্ত্বে বেড়ে যায় লাস, / আজীবন আয়তক্ষেত্র জুড়ে—উত্তরাধীকার সূত্রে অমোঘ মৃত-সন্ত্রাস' লেখেন 'জানি আমার মৃত্যুর পর আমার কঙ্কাল বিদেশে রপ্তানী করলেও পিতৃঋণ শোধ হবে না।' 'আমরা মৃথবদ্ধ মদ্যপায়ী হবো কিম্বা আত্মহননে কুশপুত্তলিকার মতো / নিজেদের পোড়াবো।...'

একথা অনস্বীকার্য যে বাংলা সাহিত্যে তাপসের মত কবিতা লেখা হয়েছে অতি অল্প। কখনো তিনি কবিতায় এক নির্জন দ্বীপের নিঃসংগ শিল্পী, আদিগন্ত নরম মৌন ভালবাসায়। তিনি লেখেন 'ত্রিতাপ উজানে ভাসে গৃহস্থ সময়, উন্মাদ হাওয়ায়, স্বেচ্ছাচারী ঘুবার / নীলার্ত অর্গান বেজে যায়—অমোঘ নিঃসংগতায়। একই সংগে রোমান্টিক, আপোষহীন, স্তব্ধ, প্রেমিক এই কবি আমাদের সময়ের জীবন্ত প্রতিচ্ছবি।

অতি অল্প বয়স থেকে চাকরী করেন সরকারী অপিসে। জন্ম ১৯৫৮ সালে। বহন করছেন কিছু বিষণ্ন স্মৃতি। এক একা ঘুরছেন কুম্ভ মেলায়, কেদার বদ্রীনাথে, ধলভূমগড়ে। এখনো অবধি শুধুমাত্র অর্থ নৈতিক কারণে তার কোন কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয় নি, যদিও কবিতা লিখছেন স্বাবলম্বিভাবে। প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যেখানে 'অনার্য সাহিত্যে' সম্পাদকের একটি কবিতাও যোগ্য বিবেচিত হয়নি সেখানে গত ৫টি সংখ্যায় তাপস চক্রবর্তীর ছাপা হয়েছে ১৮টি কবিতা এবং একটি সাক্ষাৎকার।

কবিতা সম্পর্কে তার বক্তব্য—:

'আজকের কবিতা হওয়া উচিৎ কবির রক্ত যাতে রয়েছে হাজারো অভিজ্ঞতা...। কবিতা রাগ সংগীতের মতো ; একটা মাদকতা, তন্ময়তায় জড়িয়ে রাখবে সারাক্ষণ। আবার যা নির্মাণে হোয়ে উঠবে রক্ত, কল্পনা আর বোধের সংমিশ্রণের যৌথ যাত্রা পথ।'

কবিতা

তুষানল

সময়ের অস্থির তাপে ও উত্তাপে, ধূসর কাগজে কুমারীরাত্রি
এইটুকুই ইঙ্গিত দিয়ে যায়—তোমারও আমার মতো কোনো
নিজস্ব বাসস্থান ছিল না কখনো, তবুও নিজস্ব প্রতিবিম্ব থেকে
কৌণিক আড়ালে যখন—প্রভাতে কৈফিয়তের শিরদাঁড়া টান করে
দাঁড়ালে ; তখন আর্তআবর্তে প্রয়াত শূন্যতার অলিক ভ্রমণ শুধুমাত্র।
তবে অনতিদূরে বাতিঘর থেকে সারাক্ষণ সতত আলোর কম্পণ
অথচ গোপনে যা ছিল তার একান্ত শ্মশান অশ্রুপ্লাবন
এ মধ্য দ্বিপ্রহরে মননের অভ্যন্তরে জলে ওঠে তার ব্যর্থতানাগ্নি তুষানল।

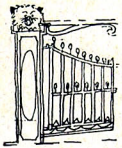

রাত্রি দ্বি-প্রহরে যখন রতিক্লান্ত প্রহর ঘোষণা হবে।

দাহময় তাপাঙ্ক আশরীরি ত্বকে, মেধামূলছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বিবর্তনের মুখে
শ্মশানভূমি কেঁদে ওঠে অস্থির সময় চক্রান্তে, তবে ধৈর্যের ত্রিধাতু
ক্রোধের অংগারের পরিপূর্ণ আহরণে পরিপার্শে সম্মুখ প্রসারী
আত্ম-অস্তিত্বের নাশকতায় মগ্ন সময় এই মুহূর্তে। বস্তুত
আতিথ্যের দীর্ঘায়িত হাত যা এখন আমার গন্তব্যের পাথেয় নয়
অথচ একদিন জন্মজরায়ুর অভ্যন্তরে আমাকে এনেছিল একান্তে যারা
আজ আত্মলীন ক্যানভাসে—প্রত্যক্ষ তাদের মুখচ্ছবি ততোধিক স্পষ্ট নয়
মেহেতু পরস্পরের বিভাজনের সুপ্ত আড়াল, আত্ম-নিমগ্ন অস্তিত্ব ও সময়
গৃহস্থের ত্রিভংগ ভুক্তাবশেষ আমার লাশ ওরা নিয়ে যাবে নিরন্ন আঁধারে
ঠিক সেই মুহূর্তে রতিক্লান্ত শহর প্রহর ঘোষণা করবে রাত্রি দ্বি-প্রহরে।

দৃশ্যতঃ সেই আদিত্য পুরুষ

এরকমই স্বপ্নের প্রহরে-প্রহরে নিত্যতার দৃশ্যতঃ সুগভীর, ফাঁদ
এভাবেই প্রতিটি মধ্যরাতে ঘটে যাচ্ছে—গভীর সর্বনাশ,

এ মুহূর্তে আমি—নিঃশব্দে অন্বেষণ করি আত্মহননের নীল গলি
যার পথ, অনন্তকাল আগলে আছে—পীত দুঃখী এক অলীক রমণী ।

তাকে আমি চিনি অদ্যাবধী, যে আমার আশরীরি হত্যাশ্চর্য্য চুম্বনে
স্মৃতি-তন্ত্রী একান্ত করেছে—অধীর ; তবু এসময়ের সর্পিল তরবারি
আমায় ক্ষমা করোনি । অথচ নিসর্গে থমকে দাঁড়িয়েছো—মেঘ,
সে ক্ষেত্রে অনন্ত দিগন্ত রেখার ওপারে আমার বধ্যভূমি নির্ধারিত হোক ।

তবে বিজন সবুজ ঘাসের নিচে—আমার অন্তিম অব্যক্ত
রক্তকণিকাগুলো হয়তো এখন বিবর্ণ ধূসর
আরো নিবিড়, আরো গহীন মননের অভ্যন্তরে নিবদ্ধ কর চোখ
এ রজনীর নভোনীল দৃশ্যের অভ্যন্তরে দৃশ্যতঃ সেই আদিত্য পুরুষ ।

পিতার হিম ঠোঁট ও আমার পাপার্ত হাতের আগুন

দিনান্তের মেঘ, আর কতকাল আমায় ত্রিতাপ উজানে নিয়ে যাবে

অন্তিম পানপাত্র হাতে শিথিল এহাত ; বহুব্যবহারে আশরীরি প্রচীন ত্বক
অতীতে, বর্তমানে কিম্বা ভবিষ্যতে বিস্মৃতির সমাধি ক্ষেত্রে অমানিশা চাঁদ,
আমার এ অবিন্যস্ত শরীরে অথবা আকীর্ণ চোখ ঝরোকায়
আর কতকাল নিরন্ধ্র আঁধার নিয়ে স্বপ্নে কখনো জাগরণে
আদিম নেশার বৃহউৎসবে মদমত্ত হবে ।

আমি শৈশবে পিতৃহন্তারক হিসেবে চিহ্নিত হোয়েছি—এবং
মাতৃদুগ্ধের বদলে—অতন্দ্র হলাহল ক্রমাগত পান কোরে
আধুনিক সভ্যতার ঐতিহ্যঅনুযায়ী প্রকৃত এই জীবন ধারণ করেছি ।
বস্তুতঃ আমি—স্বয়ংশয়তান রূপে আত্মজ ভালোবাসায় আমাকে
সর্বক্ষেত্রে, পতিতাপল্লীর রমনীর মত উপভোগ্য করে তুলেছি
অথচ দ্যাখো, আমার স্নেহ পরায়ণ পিতার হিম ঠোঁট
আমারই এই পাপার্ত হাতের আগুন চেয়েছেন—অন্তিমে

নরক চতুর্দশী রাত্রি

আগামী শীতে আমি আরো বেশী যন্ত্রণাক্লিষ্ট নীলার্ত হবো
মদের বোতলের গহীনতা খুঁজতে গিয়ে—আমার সাথে প্রথম
মৃত্যুর সমান্তরাল শয্যায় অপেক্ষামান ঘোরদর্শনা রাক্ষসী একজন ।

অথচ অমৃতের পুত্র আমি ও…সেই মহার্ঘ মণি অন্বেষণে মৃত্যুকবচ কথন
খুলে দিয়েছিলাম—তাম্রাভ যুবতীর হাতে সুতরাং নরকচতুর্দশীরাতে
অলৌকিক হত্যাকারীর যাদুদণ্ডের সুতীক্ষ্ণ ফালে—এ শরীর
ছিন্নভিন্ন হবে—তখন অদ্ভুত শব্দ উচ্চারণে অদৃশ্য প্রহরীরা তোমাকে
সে সংবাদ পৌছে দেবে ; সময় হলে তুমি একান্তে এসো
অনুত.পরাহিত মাটির কাছে—এ শরীর তখনো নিমজ্জিত থাকবে ।

গত রাত্রের মল্লার স্বামী এবং তুমি

মায়াবী বল্কলে ঢেকেছো মুখ অথচ তোমার
নিকোনো শারীরিক উঠোনে গতরাতের রতিকলঙ্কের দাগ,
এ মধ্য দুপুরে অন্ধকারকে অমোঘ বিষয়ে স্পর্শ করে
বার-বার ; এখন মেঘ টিলায় চাঁদ—আমি
চোখে ত্রিশূল হেনে তোমার দিকে চেয়ে দেখি—এবং
বুকের গভীরে এক অন্ধচাপা গোপন দীর্ঘ নিঃশ্বাস,
আর তুমি-গ্রীবাভঙ্গীর নিপুণতায় বাতাসে ছড়িয়ে দাও কোমল গান্ধার ।

আমি তোমার শারীরিক উজানে এক রাত্রের মল্লার স্বামী
অথচ তোমার শরীর সর্বস্ব পণ্যতরা, জীবন ঘূর্ণাবর্ত
ঐতিহাসিক নাম নিয়েছে গোপন স্বৈরাচারিনা ।

অস্তিত্বের ব্যাপ্তি জুড়ে যখন তুমি

গভীর-গহনে নেমে অবগাহন শেষে তুমি উঠে এলে
জলছবি, ছায়া নাচে—নিথর মাটির উপরে ; তবে আমার
উৎকোচে দিন আনি সময়, চতুষ্পার্শে অমোঘ প্রাচীর তুলেছে

অথচ এই আমি একদিন নিরুদ্দেশের সড়ক অব্দি একটানা হেঁটেছি

কিন্তু ক্রমশঃ আশাতীত অভ্যর্থনায় আমাকে ঢেকেছো—তুমি
এ আমার নির্ধারিত বধ্যভূমি—যেন দিকভ্রান্ত নাবিকের
দাঘল চোখের শেষ সীমানায় দাঁড়িয়ে আছে—তার একমাত্র প্রেয়সী।

সে ক্ষেত্রে আমি নাভিমূল থেকে তুলে আনি—অমোঘ তরবারি
আজ আমার অস্তিত্বের ব্যাপ্তি জুড়ে তুমি ফিরে এসো মুণ্ডমালিনী।

উচ্ছিষ্ট তাপস

দেহ থেকে খুলে নাও প্রণয়ী বন্ধন
আমার আরাধ্য যা কিছু··· স্বতন্ত্র,
দানবীয় হলাহল ও স্ববিরোধ ; এ
হত্যাউৎসবে আমি—একমাত্র একক।

অথচ হিম প্রবঞ্চনায় পরিত্যাজ্য
তার ব্যবহার জীর্ণহৃদয় ; ঐ দূরে
ধূসর দিকচক্রবালে স্বপ্নেরা গিয়েছে তার
সহমরণ ; এবার আমাকে পরাও
জন্মেজয়ের আরাধ্য মৃত্যু তিলক।

তবে কেন তুই, প্রতিটি মধ্য নিশিতে
কাঁদিস—জননীজঠোর ? নিঃশেষে
আমি, আদি থেকে অন্তিম আজানু
পাথর ; নিরুদ্দেশের শ্মশান ভূমিতে
এ মুহূর্তে দগ্ধ হোয়ে যাচ্ছে—উচ্ছিষ্ট তাপস।

তোমরা কজন

শব্দের পদতলে সুরম্য প্রসাদ, যথার্থ সম্বোধন
জানে না—বাতাস; আজন্ম সঞ্চিত স্রোত করতলে
গাঙের গভীরতর রহস্য জেনে ভাবো যদি তোমার কি হবে!

তবে অতি দূরদেশে প্রেয়সী আমার নাভীকুণ্ডদে অকস্মাৎ অগ্ন্যুৎগার
ঠিক সে সময়—মনস্থালীতে স্ব-শব্দে বয়ে যাচ্ছে মিথুন বাতাস,

অথচ ভ্রাম্যমান আমাদের যাবতীয় সকলের পথ, তখন যদি
ত্মাখো—আরোগ্য চেয়ে তাপস হয়েছে কখনো সুনিপণ তস্কর,
তৎক্ষনাত অকপটে তাকে বলে ফ্যালো সুপ্রাচীন
এক হত্যাউৎসবের জন্য তোমরা প্রস্তুত হয়েছো কজন।

অনতিক্রমন

আমার চতুষ্পার্শে অনতিক্রম্য আঁধার এবং তারই মধ্যে
পথের বিসর্পিল পুর্বাভাস, দৃশ্যত এ সময়ের নিপুণ বিন্যাস,
অথচ আদিম সময় অনুশাসনে আমার নির্ধারিত তির্যক কম্পাস
সেই পথেই আমার দৈনন্দিন নৈশ্য পদচারণের অভ্যাস।

এ মুহূর্তে আমার চোখ চাতালে এ সময়ের জতুগৃহের দেওয়াল
ও তার মধ্যে-আবদ্ধ আমি এবং অনন্ত অব্যক্ত হাহাকার

কার্য্যত সম্প্রতি আমি, ঘুরে আসি ঋতুমতী চরাচর
সেখ নে দেখি—উদার ত্রিভুজ ভূমে উঠেছে বন্ধ্যাত্বের চাঁদ।

অথচ এই আমি একদিন অগ্নিগোলকে ফেলেছি আত্মকেন্দ্রিক লাভা
সুতরাং এ সময় অনুশসনে স্তম্ভিত জন্মজরায়ুতে
অনতিক্রম্য আমার সন্তান—সন্ততি

দূষণ

শব্দ কোরোনা থামো, শোনো শব্দের দাবানলে পুড়তে পুড়তে
এ স্মৃতি শহর, তোমাদের একদিন ভস্মিভূত হবে, তখন
গন্তব্যের পথ বহুদূরে সরে গ্যাছে দেখা যাবে ইতিমধ্যে,

শিরাময় রক্ত কণিকারা তোমাকে প্রশ্ন করবে, দ্যাখো তুমি কি
বিষ-বৃক্ষের অনন্ত মূল লুকিয়ে রেখেছো সবার অলক্ষে।

সময় হয়েছে আস্তাকুঁড়ে তুষের আগুন, বারুদের স্তূপের
বহুক ছে সুচিহ্নিত আলিঙ্গনে এগিয়ে যাচ্ছে—নিঃশব্দে।

এভাবে ব্যুহ উৎসবের শেষ প্রহরে তুমি মুগ্ধ মৌন মন্ত্রোচ্চারণের মতো
একান্ত স্থির হয়ে আছো ক্রোধান্ধ হন্তারকের ছুরিকার নিম্নে।

একান্ত অন্তিমে আমি যখন

কাল সারাটা রাত কেটে গ্যাছে উত্তাপহীন বিছানায়
অথচ নিমশব্দবন্দে জড়িয়ে আছো পথপ্রান্তর কিন্তু আমাদের
সারল্যের উঠোন, এখন বড় বেশী সংকীর্ণময়। তবে মেধাকোষ
অবিরত আউড়ে যাচ্ছো-বাণিজ্যিক শ্লোক এবং বিভ্রান্তে আমাদের-পথভ্রম

এ সব আমাদের জ্ঞাতব্য বিষয় সুতরাং আমরা ও অভিন্ন হৃদয়
কিন্তু ঋতু চক্রে প্রাত্যহিক দ্বিধা বিভক্ত উরুসন্ধির মতো এক-একটি-মধ্যরাত
আমাদের আত্মদাহপর্ব সম্পন্ন করে শ্লথ আমূল অন্ধকারে একান্ত-অন্তিমে।

এ ভূত্বকের সাড়ে তিন হাত জমি

বুকের ভিতর শোকার্ত তীক্ষ্ণ ছুরি, তৃষ্ণাতুর চোখে
মুগ্ধ দৃষ্টি ; তার অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বরে ছিল—অন্তিম চিতাগ্নি।
আমি ভস্মের শেষ আধার ভেঙ্গে আজীবন—একমাত্র
সেই তাপসকে খুঁজে চলেছি অদ্যাবধি।

তোমার সঙ্গে যাবো না—আমি, সহসা তুমি—আগুনে পুড়িয়েছো
রতিপল্লির সমস্ত ঘর বাড়ি ; অবশ্য এখন অতিক্রান্ত আমার
বছরগুলি—স্রোতসঙ্গে সাংঘ্রিক নিস্পলক খড়—কুটো যদিও
তবু জেনো, অতিনৈসর্গিক কোনো রাত্রিতে—এ ভূত্বকে
সাড়ে তিন হাত জমি আমার জন্য ঠিকই নির্ধারিত ছিল।

গদ্য

আমরা মনে করি, একদিন কবিতার জরায়ু থেকে আত্মপ্রকাশ করেছিল বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড, তার নিভৃতি, স্থিতি আর আলোড়ন অনাগত কালের দিকে বাড়িয়ে রাখুক, অনাবিল হাত। তার চেতনার বীণাতেই একদিন নেচে উঠেছিল ছন্দ, তার কথকতা সূর্যমুখির মত অম্লান ভঙ্গিতে সৃষ্টির ইতিহাস শোনাক। কবিতা হোক আমাদের প্রথম কথা, যাত্রাপথের দিশারী ; এবং দ্যাখাক বাঁচার সার্থকতা। কবি ও তার পাঠকের মধ্যবর্তী সাঁকো থেকে কবিতা হাজার হাতে ছড়িয়ে দিক অভ্র আবীর আর যাবতীয় রহস্যের চাবিকাঠি।

তবু আজ যেন ক্রমে ক্রমে দৃঢ় মুঠি শিথিল হয়ে আসছে, রক্তের এক নাম জীবন, কাব্যের আর এক নাম ? কি জানি ; বড় বেশী চোরাটান বড় বেশী আর্তস্বর ! শেষ ঘোড়ার উপর বাজি রেখে শুড়িখানায় যারা ফলাফল নিয়ে তর্কে তর্কে বাতাসে ছড়িয়ে দ্যায় বারুদ, যারা অন্ধকারের কাছে নিঃশেষে নতজানুতায় দীক্ষা নিয়েছে, আমরা জানি ধ্রুবতারা নেই তাদের না ধ্যানে, না জীবন-যাপনে।

একদিনের প্রতিশ্রুতি যদি স্ফুলিঙ্গের চরিত্রে পর্যবসিত হয় তবে তো সন্দেহের তীর আপনা আপনি ফুটে ওঠে চোখে। বারবার শিবির বদল আত্মবিশ্বাসের ভরাডুবির অন্য নাম। আমরা সূর্য হতে চাইনি—জোনাকির প্লাবনে মুছে দিতে চেয়েছি স্থির রাত্রির সংকট। অভ্র আর আবীরের স্বপ্ন আমরা ভুলে যাইনি, ভুলে যাইনি সন্তান হারা মায়ের চোখের অপলক চাউনির সংগত বিষাদ। তবুও মনের মধ্যে কোথাও যেন ডমরু বাজছে। কবি হোক কালের অতন্দ্র প্রহরী।

আমরা নিশ্চিত বুঝতে পারছি, আমরা যারা শিল্প সাহিত্য এবং সমগ্র শিল্পের অস্তিত্বকে নিয়ে পরস্পর প্রতিবেশী থেকেও ঘনিষ্ঠতর কখনোই হতে পারি নি। এক নিরবচ্ছিন্ন হতাশা, বিষন্নতা আমাদের পরস্পরের নির্মাণকল্পে অবলম্বণহীন করে তুলেছে, এবং বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ করে ফেলছে এই মুহূর্তে। কিন্তু কেন ? এই আশির দশকে এই সময়ের সাহিত্যের গুরুত্ব অনেক বেশী, আরেকটু ভাল করে পরস্পরের দিকে তাকালে এবং নিজের অস্তিত্বের দিকে গভীর ভাবে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে আপনি নিজেই বুঝতে পারবেন অর্থাৎ আমি, আপনি, আপনারা সবাই মিলে এই বাস্তব সত্যটিকে অস্বীকার করে চলেছি কি নির্মম ভাবে।

তবু ও আমরা হতাশ হইনি কারণ, আমরা মনে করি নিঃস্ব নিঃসঙ্গ থেকেও সাহসী সৎ এবং শক্তিশালী হওয়া সম্ভব। এই বিশ্বাসে বিশ্বাসী আমরা হতে পেরেছি তাবলে আত্মতুষ্টি আমাদের এখনো গ্রাস করতে পারেনি।

হ্যাঁ; আমরাই অপ্রত্যাশিত ভাবে দাবি করছি—অন্য-অন্য দশক থেকে আশির কবিদের কবিতা হোক স্বতন্ত্র। এই মুহূর্তে কবিতার মোড় ঘোরাটা অবশ্যই অপরিহার্য। বাংলা কবিতার পালা বদলের আরেক দশক গুটি গুটি পায়ে আমাদের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। আশির তরুণতম কবিরা কিভাবে এর সার্থক রূপ দেবে, সেটা ওদেরই কলমে নির্দেশিত হোক। আগে থেকে আতঙ্কিত বা আহত হবার মতো কিছুই নেই। আমরা অর্থাৎ হে প্রিয় পাঠক আপনি আশির কবিদের ক্যানভাসে দৃষ্টি রাখুন এই মুহূর্তে। কারণ, প্রকৃত আমি যাদের আশির কবি বলে মনে করি তারা কখনই উচ্চাকাংখা বা খ্যাতির মোহে ভোগেনা। নিরন্তর পরীক্ষা নিরীক্ষার মধ্য থেকে নিজেদের আবিষ্কার কার্যে ব্রতি তারা এ ক্ষেত্রে। কফি হাউসের কূটকচালী কিম্বা আত্মকলহে না মেতে নিজেদের আত্মপ্রতিবিম্বের সামনে দাঁড় করাতে শিখেছে। বিভিন্নভাবে কৌনিক থেকে নিজেদের দেখাটাই এই মুহূর্তে আশির কবিদের কাছে অনেক বড় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

হ্যাঁ একথা সত্য আমরা যারা 'কলকাতার হ্যামলেট' কে নিজেদের কাগজ বলে মনে করি—নিজেদের কবি খ্যাতি বা যশের মোহে পড়ে নয়, বা নিজস্ব গণ্ডির মধ্যে আবর্তিত থেকেও নয়, কারন 'কলকাতার হ্যামলেট' এর প্রতিটি লেখকই ক্ষমতাবান এবং সর্ব অর্থে ই প্রতিভাবান ও এসময়ের সম্মুখ বিরোধী চরিত্র।

আধুনিক বিজ্ঞান, যেমন জীবদেহের ভিতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সঠিক অবস্থান জানার জন্য এক্স-রের সাহায্য নিয়ে থাকে, ঠিক সেই ভাবেই আশির কবিদের ক্ষমতা সম্বন্ধে সঠিক আস্থান্বিত হয়েই 'কলকাতার হ্যামলেটের' প্রতিটি পাতার এক্স-রে প্লেটে আশির কবিদের ঝক্‌-ঝকে কবিতা আমরা আপনাদের সামনে উপস্থিত করবো তার জন্য সম্পাদকের প্রিয় পাত্র, বন্ধু-বান্ধব বা দাক্ষিণ্যের অপেক্ষায় থাকার প্রয়োজন পড়েনা। তবুও আমাদের আদর্শগত একটা পথ অবশ্যই রয়েছে, কারণ এখনো আমরা পথভ্রষ্ট হয়ে পড়িনি বা অহেতু বাটাম দিয়ে বাঘ মারার আগাম প্রস্তুতি বিষয়ক মাতামাতিও করিনি।

যেহেতু আজ যে কোন কবি বা অ-কবির পক্ষে বেশ কয়েক গুচ্ছ ছাপ্য কবিতা

অহেতুক অপরিকল্পিত ভাবে লিখে ফেলা সম্ভব। ঠিক সেই রকম কবিতা আমাদের দপ্তরে প্রতিদিন দু-দশটা আসছে। তার সাথে কাকুতি মিনতি করে চিঠিপত্র, তাছাড়াও হাতে গুঁজে দেওয়া কবিতা; আরেক সম্পাদকের কাগজে কবিতা ছাপার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ আরেক সম্পাদকের পাতলুনহীন আবেদন পত্র স্বত্বেও তাদের কবিতা আমরা ছাপতে পারি না। কারণ শুধুই কবিতা লিখিয়ে হলেইতো চলবেনা। তার সাথে নূন্যতম সততা ও নিষ্ঠা থাকা তো চাই।

এখন বেশ অভিজ্ঞতার চোখ দিয়ে দেখতে পারছি, বাংলা সাহিত্যের প্রেক্ষাপটে বহু ব্যর্থ লোকজনের আবির্ভাব ঘটেছে ও ঘটছেও। এ ক্ষেত্রে আপনি পাঠক আপনার দায়িত্ব অনেকখানি, এ কথাও সত্য লিটিল্ ম্যাগাজিনে প্রকৃত লেখকদের লেখা যে শোচনীয় ভাবে হ্রাস পাচ্ছে দেখে আঁতকে উঠতে হয়। সুতরাং ভেবে দেখুন ধান্দাবাজিতেই অনেক সময় তো যাচ্ছে। আসলে মোদ্দা কথা এই দশকে কেউ কাউকে বৈতরণী পার করে দিতে পারবে না, বা পারছে না। না-না মশায় আপনি অযথা ভুল বুঝবেন না কাউকে গালাগালি দেওয়া বা ঝগড়াঝাটিই আমাদের নিত্যকর্ম নয়।

একথা সত্য আপনাদের ভয়ঙ্কর চালাক চতুর মুখচ্ছবি চিনে ফেলেছি। বিগত দশকের অভিজ্ঞতায় আমরা অভিজ্ঞ হতে পেরেছি। তাই আমরাই একমাত্র পারি সাতন্ত্র নিয়ে গর্ব করতে। কারণ একথা আগে থেকে জেনে রাখা ভালো 'কলকাতার হ্যামলেট' নাবালক কবি বা অর্কাবিদের চারণ ভূমি নয়। একথা আগে ও বলেছি আপনাদের। তাই একান্ত বন্ধু হয়েও অনেক কবিবন্ধুর কবিতা আমরা ছাপতে পারিনি।

তবু হে প্রিয় পাঠক আপনাকেই বলছি, আজকের বাংলা কবিতার সাথে আপনার যদি কোন রকম যোগাযোগ না থাকে আমাদের অর্থাৎ আশির কবিদের কবিতা পড়া আপনার পক্ষে নিরর্থক, তারচেয়েও শতগুন আমাদের পক্ষে। এ থেকে আমাদের মুক্তি দিন অন্তত। অবহেলা করার আগে (বুঝে বা না বুঝে) কিম্বা উচ্ছ্বাসের চিঠির আগে আর একটু সতর্কতা আপনাদের কাছে আশির কবিরা একান্ত ভাবেই আশা করে। একথাও ঠিক আমরা কখনই বলব না আমাদের কবিতা পড়ুন (না বুঝে) বা নাই পড়ুন তাতে আমাদের কিছুই যায় আসেনা। কারণ, একথা সত্য কবিতা কখনই সর্বসাধারণের জন্য নয়, অপরিণত, অনুপযুক্ত মন কখনই কবিতার রস গ্রহণ করতে পারে না। তারা শুধু দুর্বোধ্য বলে

চেঁচায়। আপনি আমাদের কবিতা বুঝতে পারলেন না সেটা আপনার দোষ, আপনি কবিতা নাই পড়তে পারেন। আমরা বাজারী কবিতার বাজার খুলে বসিনি কবিতা বেচার জন্য, যে সমস্ত বাজারী ব্যবসায়িক কাগজগুলো আপনাদের অত্যন্ত নিম্নমানের ও অলেখকদের বিরক্তি-বর্ধক কবিতা পরিবেশন করে এসেছে তার জন্য আমাদের আপনারা কি করে দায়ী করেন ?

হ্যাঁ মানছি কবিতা লিখিয়ের দল পাকাল মাছের মত গিজ-গিজ করছে। আমাদের ও আপনাদের চারপাশে। আর যখন দেখি একজন প্রকৃত সৎ নম্র তরুণ কবি লাঞ্ছিত হচ্ছে তখন আস্তে আস্তে রাগ বাড়ে। তবুও আমরা এখনও কবিতার প্রতি সামগ্রিক আস্থা রাখি।

'কলকাতার হ্যামলেট' ফেব্রুয়ারী ১৯৮৫ সংখ্যার সম্পাদকীয় ওপরের গদ্যটি। সম্পাদকের অনুমতি নিয়ে ও এর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এখানে ছাপানো হোল।

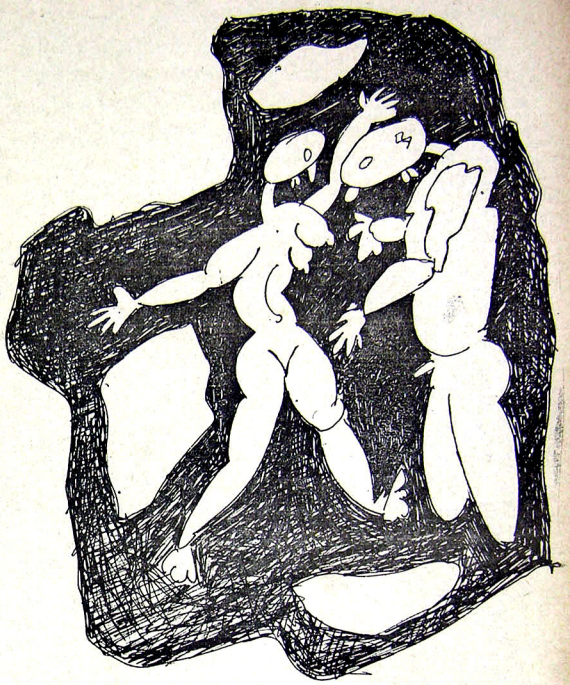

মণীশ সিংহ রায়

কিছুদিন পূর্ব পর্যন্ত শুধুমাত্র কবিতা রচনাতেই বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। এখন কবিতাকে শুধুমাত্র নিজের সন্তুষ্টি বিধানের জন্য বলে মনে করেন না। তিনি তাঁর ও বন্ধুদের কবিতার পূর্ণ প্রচার দাবী করেন। বিশেষ কোনো মতাদর্শে বিশ্বাসী

নন। শুদ্ধ নিয়ম-তান্ত্রিক জীবন যাপন করেন। প্রাতে যোগভ্যাস ও ঈশ্বর অর্চনা হয়েছে। ইসকনে এখন চাকরী করেন। আগে কিছুদিন Times of India-য় কাজ করেছেন। তিনি গোয়েঙ্কা কলেজের গ্র্যাজুয়েট। নিশ্চিন্ত, ফল সম্পর্কে উদাসীন, তৃপ্ত মনে হোলেও কোথাও গভিরে একটি অভাববোধ কাজ করে বোঝা যায়। তর্ক এড়িয়ে চলেন, 'প্রতিষ্ঠান' শব্দটিকে অস্বীকার করেন। এমানতে আত্মকেন্দ্রিক স্বভাবের তবে সামাজিক। দর্শন তার প্রিয় বিষয়। গান ভালবাসেন। ছবি আঁকতেন একসময় এখন সময় নেই। নিজের কোনো কাগজ নেই তবে নানা জায়গায় লেখা ছাপা হয়। আসামে থাকতে 'প্রয়াস' নামে একটি কাগজ বের করতেন। জন্ম ১৯৫৬ সালে আসামের ধুবড়ীতে। নারীদের প্রতি কোন আকর্ষণ নেই। কবিতায় রচনার জন্য যে শ্রম প্রয়োজন তার চর্চা করেন। তাঁর কবিতা স্বচ্ছ শরীরে ঈশ্বরের মুখচ্ছবি আছে।

কবিতা

ঈশ্বর-স্পর্শ

ঈশ্বর তোমাকে ছুঁয়েছি তুমি ব্লেডের মতো

অজস্র নক্ষত্রের প্রেম মেখে গায়
মেঘমালা উড়ে যায়, উড়ে যেতে থাকে
গোপন পিয়ানো বেজে ওঠে চিতার আগুনে
উপলব্ধির রক্ত মেখে গায়
আমি সেই অগ্নি থেকে উঠে আসি ব্লেডের জগতে

আত্মার এ যে কি বীভৎস নেশা
যে ব্লেড খণ্ডিত করে দেহ
তবু বোধ তাকে পেতে চায়
নাভির সূক্ষ্ম টানে খণ্ড শরীর নামে মিয়ামী বীচের মায়ায়
অন্য খণ্ডটি ঝুলছে মহাকাশে

ঈশ্বর তোমাকে চিনেছি, জেনেছি বহুবার
তবু পূর্ণ দেহে পারি না পৌঁছতে
অনুভবের রূপমালা বার বার অবনত
হয়েছে সে ব্লেডের কিণারে।

একবিংশ শতাব্দীর দিকে

একটি রোগা কালো হাভাতে শিশু
সারা বিশ্বজুড়ে রেখেছে তার পা
আর আকাশ তোলপাড় করে খুঁজে চলেছে
একটা জানালা

পরমাণু চুল্লীর ভিতর থেকে
মহাজাগতিক ইঁদুরের গান ভেসে আসে
পরীদের রক্ত মেখে গায়
মানুষের সাটেলাইট উড়ছে আকাশে

মাংসের রোমল ভাস্কর্য আঁকড়ে
মানুষ ক্রমশঃ শীতল হচ্ছে, ফিকে—
ভীরুদের জন্য কোন শান্তনা পুরস্কার নেই,
এই কথা বলে
হলুদ পাখিটি উড়ে গেল একবিংশ শতব্দীর দিকে।

আমার বিষাদ জন্মের প্রতিবেদন / ৪

আমার প্রেমিকা এ গৃহে থাকে না, থাকে কৌতিকা নক্ষত্রে
সহস্র আলোকবর্ষ দূর থেকে নিভৃত যে রশ্মি ভেসে আসে
সেখানে আমি তারই ছায়া পাই, গান শুনি, অন্ধকারে একা।

আমি এ গ্রহের কেউ নই, কিছুদিন বেড়াতে এসেছি, রিপোর্টার···

নরম কাদার মতো এ গ্রহের বড় বেশী মায়া—
মাঝে মাঝে ভুল হয়, মনে হয় আমি এ গ্রহের কেউ
তখন নিঃসঙ্গ লাগে, এই গ্রহের নিয়মে এই গ্রহের শরীর কিছু চায়
চায় প্রেম, চায় দয়া, চায় নীলাভ সোহাগ।

এখানে আমাকে এসব দেবার মতো কেউ নেই
আমি এই পৃথিবীর বাড়তি পুরুষ

মনে পড়ে প্রেমিকার কথা
যে রয়েছে কৌতিকা নক্ষত্রে
দূরে।

মাঝখানে

ঐখান দিয়ে চলে গেছে বুঝি বিষুব রেখাটি
আমি তার কিনারে বসেছি

ঐ দিকে ধু-ধু গ্রাম এদিকে শহর
মাঝখানে কবি একা শিব সওদাগর

কোনদিন দেখিনি যাকে, তাকে একবার দেখে দিতে হবে ;
কবে ?
এইভাবে দুই পা বাড়িয়েছি যেই ওদিকে
দেখি এদিক থেকেই সে হঠাৎ ডেকেছে

তবে কি দু'দিকেই আছে।
কাছে !

ওদিকে জীবন, এদিকে মৃত্যু
মাঝখানে বসে আছে শিশু, জানে না কিছু।

রহস্য প্রেতিনী জানে

ফের প্রেত জেগে ওঠে রাতে
তার মাংসের বরফ গলে লাভাস্রোত জাগরিত হতে থাকে।

আহা কি যে আনন্দ প্রেতের
সমস্ত শরীর জুড়ে দাউ দাউ আগুন জ্বলেছে ফের।

রক্তবর্ণ, হলুদ, নীল, কখন ও বা সবুজ
নানান রঙ্গীন আগুনে সাজে প্রেত, আর আকাঙ্খার সূচ

তখন তাকে অনবরত খোঁচায়।
সে যে কী পেতে চায়

সে রহস্য শুধু প্রেতিনী জানে
ফলে শরীর পোড়ার গন্ধে ঘুম ভাঙে ;

দেখে, প্রেত জ্বলছে ধিকি ধিকি, লাল,
আর অমনি প্রেতিনী তার বিশাল

বরফ ডানাটি মেলে জাপটিয়ে ধরে সেই আগুন শরীর ;
এইবার প্রেত আগুন নেভার অনুভবে বিভোর, স্থির।

মূর্খের স্বর্গ

মূর্খের স্বর্গ থেকে নেমে আসছে অন্ধকার
মোহযোনিপ্রেম মূখর মৃত্যুময় ধূসর পৃথিবীতে।
ক্ষয়িষ্ণু সম্পর্কশীল এই তামাশা জন্মের উদ্ভব-সূত্র
আজও চূড়ান্ত স্থায়িত্বালিঙ্গনের চিত্রকল্পের মতো
মানুষের হলুদ মস্তিষ্কে ভাসমান, অথচ
বায়ুস্তর ভেদ করে চাঁদ থেকে কিভাবে
মানুষের দিকে অস্ত্র ছোঁড়া হবে
—সেটা ভাবা হয়ে গেছে।

চোখ ছিঁড়ে সমস্ত স্বপ্ন বেরিয়ে এসে হয়েছে ইউরেনিয়াম—
মাউন্ট এভারেষ্টের চূড়ো ফেটে চৌচির হয়ে
নেমে আসছে বরফ
সারা রাত স্থলনের গর্জন শোনা যায়
আমি পৃথিবীর অভিশাপ কুড়োতে কুড়োতে
তোমার কাছে আসি,
এইখানে সাদা চাদর ঢাকা বিছানায় তুমি অপেক্ষমান
তোমাকে পাহারা দেয় অন্ধকার।

ঝুলন

তুমুল রাত্রির ঘন ঘোর গর্ভের ভিতর থেকে
কে যেন ডেকেছে। ভেঙে যায় ঘুমন্ত শিবির।

শুরু হয় ছিন্ন প্রণয়; রাত্রির নিঃস্তব্ধ হিমের সঙ্গে
নিশীথকণাগ্রাসী এবং মাংস পুতুলের।

অস্থিতে অস্থিতে নড়ে প্রেম; ধমনী উষ্ণ হয়
অবশেষে রক্তের সৌকর্য ভেঙ্গে শরীর দুলে ওঠে।

দুলে ওঠে প্রবাল দ্বীপের মতো ঘন অন্ধকার, মহাকাল,
আর জিহ্বার নিবীড় নিঃসঙ্গতা

কোটি নক্ষত্রের অলীক আলোকস্রাবে ভাসমান
পিপাসার্ত আত্ম-জিগীষার ছায়ার ভিতর,
মৃত্যুর শীতল মূর্তি মুখোমুখি কোনা তোলে অনন্ত জিজ্ঞাসা
দোলে।

গদ্য

আমি যে কেন কবিতা লিখি, কিভাবে লিখি তা আমি নিজেই জানি না। ব্যাপারটিকে আমার নিজেরই মাঝে মাঝে তুমুল হাস্যকর মনে হয় এবং ততোধিক রহস্যময়। আমি যে প্রথম কবে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলাম, সেটি আমার জীবনের প্রথম পরিহিত জামার রঙের স্মৃতির মতো—আজ আর মনে নেই। আমি যা লিখি তা যদি কবিতা বা কবিতার মতো কিছু হয় তবে বলা আমার কবিতা লেখা বা লেখার চেষ্টা করার পশ্চাৎপটে তেমন ইতিহাস বা ঘটনার আকস্মিকতা নেই।

গোঁমড়া মুখো বেরসিক কোন কোন মানুষ বলাবলি করে যে, যাদের খেয়ে দেয়ে কোন কাজকর্ম নেই তারাই কবিতা লেখে। কিন্তু একদিন এক ঘুম না আসা রাতে মশারির ভিতর শুয়ে শুয়ে আমি চিন্তা করে দেখলাম যে খেয়ে আমাকে বেশ কিছু কাজ কম্মো করতে হয়। প্রায় প্রত্যেক দিন খেয়ে দেয়ে আমাকে দৌড়তে দৌড়তে অফিসে যেতে হয়। সেখানেও আমাকে দায়িত্বপূর্ণ কাজ করতে হয়। এছাড়াও আমি থলে হাতে বাজারে যাই, কেরোসিন তেলের লাইনে দাঁড়াই, রেশন আনি, মাঝে মাঝে ঘরও ঝাঁট দেই, পড়াশুনা করতে হয়, ঘুমাই ইত্যাদি বেশ কিছু কাজই আমাকে করতে হচ্ছে। তা বলে আমি নিজেকে কর্মবীর বা হনুমান বলে দাবী করছি না। কিন্তু এই সমস্ত কাজ আমাকে করতে হয় আর এই নিয়মিত অনিয়মিত কাজের মধ্যে থেকেই, আমার যেমন প্রেম পায়, কান্না পায়, হাসি পায়, গান পায়—ঠিক তেমনি কবিতাও পায়। হাসি, কান্না গান, প্রেম এইসব হয়ত প্রায় সবাইকেই পায়, কিন্তু কোন কোন হতভাগাকে কবিতাও পায়। আমাকেও পেয়েছে। আমার অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি, অনেকের ধারণা রয়েছে যে প্রেমে পড়লে বা প্রেমে ব্যর্থ হলে লোকে কবিতা লিখতে শুরু করে। হয়ত লেখে। কিম্বা লেখে না। কিন্তু আমার জীবনে এসব কোনটাই ঘটে নি ফলে এক এক সময় মনে হয় আমার কবিতা লেখার কোন মানেই হয় না তবু লিখি। লিখতে বাধ্য হই। এ যেন এক নেশার মতো, ব্যাধির মতো, খেলোয়াড়ের মতো, নিয়তির মতো আমার পিছু নিয়েছে। অথচ 'লেখ' বললেই লেখা যায় না। এ এক অদ্ভুত যন্ত্রণা। হাতে বেশ সময় আছে,

এরকম সময়ে কতদিন কবিতা লিখবার জন্য কাগজ কলম নিয়ে বসেছি। মধ্য রাত্রি পার হয়ে গেছে। তবু কবিতা লেখা হয়ে ওঠে নি। কখনও কখনও হয়ত বা তিন চার লাইন হয়েছে। কিন্তু এর বেশী এগোয় নি। কিন্তু অধিকাংশ সময়েই আমি যখন বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা মারছি, বাসে ট্রামে চড়ে কোথাও যাচ্ছি, অথবা দোকান বাজার করছি এমনি সময়ে হঠাৎ কোথা থেকে যে দু একটি লাইন ঝিলিক মেরে যায়—আমি শিহরিত হয়ে উঠি। আমি জানি ঐ সময় যদি ঐ লাইনগুলিকে একটু প্রশ্রয় দেওয়া যেত, তাহলে এক একটি কবিতা বেরিয়ে আসতো, কিন্তু আমি ঐ অবস্থায় কি করব? খাতা কলম নিয়ে তো আর বাজার করতে যাওয়া যায় না। বাজার করতে করতে হঠাৎ কবিতা লিখতে গেলে, লোকে বলবে আঁতেল। একটু ভীড় বাস ট্রাম হলে, কোন সুন্দরী নেই আমাকে কিল্ মেরে নামিয়ে দেবে। আর এইসব হঠাৎ ঝিলিক দেওয়া লাইনগুলো, শব্দগুলো এত দ্রুত হারিয়ে যায় যে বাড়ী ফিরে ঠিকঠাক মতো মনে থাকে না। এটা আমার জীবনের একটা ট্রাজেডী বলা চলে। ফলে এভাবে প্রচুর কবিতার বীজ আমি হারিয়েছি এবং হারাচ্ছি।

কবিতার দুর্বোধ্যতা নিয়ে প্রশ্নটি অনেক দিনের। এ ব্যাপারে নানা আলোচনা, কথা বলা হয়েছে। আমি যে সব কথায় যেতে চাই না। আমার শুধু আজকের সমাজ, মানুষের সম্পর্ক, কাজ কর্মগুলি খুব দুর্বোধ মনে হয়। এ কথা সত্যি— অন্তত আমি অনুভব করি, আজকের সামাজিক কাঠামো, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক, ইত্যাদি ব্যাপারগুলি এখন আর ততটা মানসিক পর্যায়ে নেই, যান্ত্রিক হয়ে গেছে। হৃদয় চর্চার ব্যাপারটি গৌণ হয়ে পড়েছে। আর কবিতাতো হৃদয়ের গহন থেকে উঠে আসা শিল্প। ফলে যন্ত্রে পরিণত মানব তা বুঝবে কেমন করে? কবিতাতো যন্ত্রের জন্য নয়, মানুষের জন্য। তাই কবিতা বুঝতে হলে, কবিতাকে গ্রহণ করতে হলে, আগে প্রয়োজন মানুষ হবার। কিন্তু এই যন্ত্র হবার প্রতিযোগীতার যুগে সেটা হয়ত আর সম্ভব নয়। তারই ফলে কবিতা সমষ্টি সংখ্যক মানুষের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছে। আবার অন্য রকম কাণ্ডও ঘটে চলেছে। অনেক চালাক চতুর লোকেরাও যন্ত্রের মতো অসংখ্য কবিতা লিখছে। এগুলোকে যান্ত্রিক কবিতা বলা ভালো। আসলে মানুষ যতই ঘোরতর যন্ত্র হয়ে উঠুক না কেন অতি সূক্ষ্ম পর্যায়ে হলেও কখনও কখনও তার ভিতরে হৃদয়বৃত্ত দুর্বলভাবে খেলা করে। ফলে কবিতা লেখার প্রবৃত্তর মধ্যেও তার যান্ত্রিক জীবনের একটা প্রভাব কাজ করে আর চতুরভাবে সে তখন প্রচুর

যান্ত্রিক কবিতার জন্ম দেয়—যেখানে হৃদয়ের স্পর্শ খুব ক্ষীণ অথবা নেই। সেইসব কবিতায় একটা কৌশলগত আমেজ থাকে, এই যা। এইসব নানা কারণে আধুনিক কবিতার 'দুর্বোধ্য' লেবেলটি থেকেই যাবে। আমাকে একবার আমার এক বন্ধু জিজ্ঞাসা করেছিল আমি সাহিত্য নিয়ে আন্দোলনে বিশ্বাসী কিনা। এটা ঠিকই যে আমি আন্দোলন করে লেখা-লিখিতে বিশ্বাসী নই, তবে নিশ্চই লিখে আন্দোলন করায় বিশ্বাসী। সেখানে লেখাটাই মুখ্য এবং সেটা আমি নিজের মতো লিখব, আর আন্দোলনটা হবে গৌণ। আন্দোলন মূলত হয় কয়েকজনকে চিনিয়ে দেবার জন্য। সমুদ্রের ঢেউ যেমন তটে আছড়ে পরে কয়েকটি বিন্দুকে মাত্র দিয়ে যায়। আন্দোলনটা হওয়া উচিত তেমনি। আমি দুর্লভ দর্শন তিমি কিম্বা অক্টোপাস হতে চাই না। শঙ্খ ঝিনুকই হতে চাই। তট থেকে কুড়িয়ে নিয়ে মানুষ যাতে আনন্দ পেতে পারে। তাছাড়া আন্দোলনের ফলে একটা বন্ধুত্বগত সঙ্ঘবদ্ধতা আসে যেটা লিখবার ক্ষেত্রে নানাভাবে উৎসাহ যোগায় মনে করি। এই সঙ্ঘবদ্ধতা স্থায়ী হলে যে শক্তি উৎপন্ন হতে পারে সেটিও লোভনীয়। আজকাল এসব নেই। সবাই কেমন বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ। যে যার তার তার ভাবে কবিতা লেখা হচ্ছে। কেউ কাউকে বেশীক্ষণ সহ্য করতে পারে না। সবাই ভাবছে ধুর! ও আবার লিখতে শিখল করে! ফলে আশীর দশকের বাংলা কবিতার ক্ষেত্রটা কেমন ঝিমিয়ে পড়েছে বলে মনে হয়। এটা খুব খারাপ ব্যাপার। তাই এই মুহূর্তে নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ হবার আন্দোলন প্রয়োজন। সঙ্ঘবদ্ধ হওয়ার অর্থ এই নয় যে, আমরা এই সময়ে যারা কবিতা লিখছি তারা একজোট হয়ে ঘোট পাকাবো আর তারপর অন্য কাউকে গালিগালাজ করব, অগ্রজদের অশ্রদ্ধা করব। সেটা অসভ্যতা। বরং সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে আমরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে বন্ধুত্বের প্রসার ঘটাবো, নিজেরা নিজেদের জানবো, এতে আমাদের মনও পরিষ্কার হবে আর একে অপরের সঙ্গে সহজ হতে পারবো, লিখতেও আরো উৎসাহ পাবো। এই সময়ে মানুষের সঙ্গে মানুষের দূরত্ব অনেক বেড়ে যাচ্ছে। আমরা যারা লিখছি, তারা যদি নিজেরা নিজেদের মনের দূরত্ব কমিয়ে আনতে না পারি, দুর্বোধ্য অসহায়বোধ, ভয়, ঈর্ষা, দুর্বুদ্ধিতাকে প্রশ্রয় দিয়ে বিচ্ছিন্নতার আধারে বাস করি, তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে আমাদের দূরত্ব কমাবো কি করে? এটা ঠিকই, যে লেখে, সে লেখে। কিন্তু তাই বলে যে রাঁধে সে কি আর চুল বাঁধে না? লেখাতো রয়েছেই। কিন্তু এইসব ব্যাপারগুলো একটু ভাবা উচিত বলে মনে করি। মানুষ যদি ভবিষ্যতে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে নষ্ট হয়ে যায়, তাহলে আর কবিতা লিখে কি ঘোড়ার ডিম হবে?

অনেকে কবিতায় নানা রকম গাইড লাইন বা পাথুরে উপদেশ প্রদান করেন। ও রকম ভাবে কবিতা লিখতে হবে, এরকম ভাবে কবিতা লিখতে হয়, এই এই আদর্শ নিয়ে কবিতা লিখতে হয় ইত্যাদি ইত্যাদি। এসব কথা শুনে আমার খুব কষ্ট হয়। আবার তারা যখন অন্য কোন শ্রেণীর কবিতাকে অগ্রাহ্য করে, নিন্দে করে আমার সেসময় খুব মন খারাপ হয়ে যায়। পৃথিবীতে হাজার রকমের গাছ পালা রয়েছে, কত শত শ্রেণীর পশু পক্ষী রয়েছে, অসংখ্য সুন্দরী নারী রয়েছে, একেক জায়গার প্রাকৃতিক দৃশ্যও একেক রকম। তবে কবিতা কেন নানা রকমের হবে না? অবশ্যই হবে যারা কবিতাকে এরকম ওরকম ভাবে ভাবতে ভালোবাসে আমি তাদের দলে থাকতে রাজী নই। তা বলে আবার কৃত্রিম কবিতাকেও কবিতা বলে মেনে নেব না। আমি বিশ্বাস করি আমাদের দেহের পরিবর্তনের সাথে সাথে চেতনারও পরিবর্তন হওয়া স্বাভাবিক এবং সেই অনুসারে কবিতাও পরিবর্তনময় হওয়া কাম্য। কেননা এক জায়গায় থেমে থাকলে তা আর এগিয়ে যেতে পারে না। আর পৃথিবীতে মৃতদেহও রূপান্তরিত হয়। অপরিবর্তনীয় থাকা এ জগতের ধর্ম নয়।

এখন সাধারণ মানুষের কবিতাবোধ সেই আদিকালে থেমে আছে। এর অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন। দায়টা একা কবির নয়। পাতাল রেলের বড় বড় ক্রেন দিয়ে মানুষের বোধ এই সময়ে টেনে তোলা সম্ভব হলে চেষ্টা করা যেত। কিন্তু তা সম্ভব নয়।

আমি কবি নই। কবিতার সংসারে আমি এক হাফ প্যান্ট পরা নাবালক মাত্র। কবিতা লেখার চেষ্টা করছি। কবিতার এই জগত কত বিশাল রহস্যময় কত রস, কত বিভিন্ন অনুভূতি, বৈচিত্র্যময় শিহরণ, শব্দের বিস্ময়—তার কণামাত্রও আমি এখনও প্রাপ্ত নই। বোধের সমুদ্রের তীরে দাঁড়িয়ে আমি তা আন্দাজ করছি মাত্র। কবিতা লিখতে চাই। আর সেই কবিতাটি যে লিখবে সেই মনীশ সিংহ রায়কে আমি খুঁজছি।

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়

'বৈপরীত্য বলে কিছু নেই' তিনি লিখেছেন। মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন। অবিন্যস্ত জীবনযাপন। নিজেকে 'মিস্‌ফিট' ভাবেন এই সময় ও সভ্যতায়। যত লেখেন পড়েন তার বহুগুণ এবং যে কোন বিষয়ে। নিজের ওপর শ্রদ্ধাশূণ্য। জন ডান, শেলী, কামু, রিচার্ড রাক্ ও গ্রাহাম গ্রীনের সঙ্গে কমলকুমার মজুমদার ও শক্তি চট্টোপাধ্যায় তাকে অনুপ্রেরণা দেয়। নিজের বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ডগম্যাটিক প্রথম শত্রু ধর্ম, সামাজিক শৃঙ্খলা। বিদেশী ব্যাঙ্কে চাকরী করেন, বিলাস নেশাগ্রস্ত হোয়ে অনুভূতির নীল পালকে চড়া। 'কবিতার রেলিং ধরে' ও 'নিরোর বেহালা' দুটি কাব্যগ্রন্থ। গল্প ও গদ্যও লেখেন। একটি নামহীন উপন্যাসেরও জনক।

কবিতা

সমগ্র শ্রীধরকে পোড়াও

হিমক্ষত জ্যোৎস্নার আচমনে উঠে এল
এক ছিন্নবিচ্ছিন্ন শিশু।
রক্ত নয়, ক্যানভাসের মত বর্ণহীন এক মুখ
অথবা মুখ নয়, আমার আত্মার বিষবাষ্প ভেঙ্গে অপূর্ণ বুদ্বুদ।

আশ্চর্য ভাঙছি না আমি কাঁদছি না,
মস্তিষ্ক ভেদ কোরে ছুটে যাচ্ছে না থ্রি-নট-থ্রি…
ভুটোকে ফাঁসি দেবার সময় তার মাসিও ক্ষণকাল
বিভ্রান্ত আকাশের দিকে চেয়েছিলো।

আর আমি এইখানে…পরিতাপহীন এক ঘুমন্ত নরক।
তবু ঈশ্বর ক্যানো তুমি বারবার আমাকে দিয়েই
প্রমাণ করাও তুমি নেই?
কেন মধ্যরাতে দুঃস্বপ্নে জেগে উঠে আমি জলের গেলাসে
শয়তানের মুখ দেখি?
কেন মদের বোতল ভেঙে প্রতিদিন বেরিয়ে আসে কুমারীর আর্তনাদ?

হে ঈশ্বর আমাকে অন্ধ করো।
হে আলোকসামান্য মিথ্যা তুমি আমাকে
ভয়ংকর বজ্রাঘাতে নিশ্চিহ্ন করো।

আমার আচমনে সন্তানের ছিন্নভিন্ন শরীর
আমার সঙ্গমবিলাসে মাতৃসমা নারীদের ছবি
নিদ্রাহীন আকাশ ও স্বেচ্ছাচারী বৃষ্টির বাগানে
আমি আগন্তুক ক্ষয়ের জীবাণু।

চিরবিশুদ্ধ অগ্নি
সর্বগ্রাসী তৃষ্ণা নিয়ে তুমি
আত্মাপ্রেমবুদ্ধি সহ সমগ্র শ্রীধরকে পোড়াও।

১৭.১১.৮৬

দ্যুতিময় এক মরণযজ্ঞের দিকে

এবার অতিসরল ভাবে আত্মহত্যার দিকে এগিয়ে যাওয়া যায়।
স্বাতী অভিমান নয়
আর্তনাদ নেই আমার মস্তিষ্কে জানো তুমি
জানে সেই সব ঘাস ও নারী আমার স্পর্শ যাদের
আত্মায় রোপণ করেছে ক্ষয়—বৃশ্চিকদংশনের।

আগামীকালের রোদ্দুর, কুমারী সময়ের হৃদয়ে আমৃত্যু অভিমান
ও সুন্দরী পৃথিবী—
এসবে আসক্তি নেই, সংলগ্ন অভিপ্সাও নেই।
আমি আর দৌড়ব না উন্মাদআশ্রমের দিকে;
এখানে স্থির সন্ন্যাস তৃপ্তিতে বসার মুহূর্তগুলিও
পৃথিবী অন্যদিন তার সংগ্রহশালায় সংরক্ষণ করতে পারে।
আমি ভয় পাই আমার এই বিপজ্জনক ধূমায়িত
হবার কালব্যাপী যুদ্ধহীন প্রক্রিয়াকে
কিম্বা তন্ময় হওয়া আবার চন্দ্রালোকিত মায়ায়,
ভয় সুগার কিউবের মধ্যে এল. এস. ডির রক্ত বিন্দু হোতে।

খুলে দাও দক্ষিণ দুয়ার।
আত্মহত্যার বাগানে যাব আমি স্বেচ্ছাচারী সম্রাটের মত
সম্পূর্ণ আড়ম্বরহীন নির্জনে
তখন
কৃষ্ণ মহাকাশে তুমুল বজ্রপাত
বিধ্বংসী রাত্রির সঙ্গীত
এবং ফুস ফুস থেকে সিগারেট ধোঁয়ার সঙ্গে বোরোনো
হলুদ ইতিহাস শেষবার আমার মুগ্ধ সান্নিধ্যে এসে
চিৎকার করবে
'আত্মহত্যা ছাড়া কবির কোন দায় নেই।'

আর আমি
শেষতম বিস্ফোরণের আগে
আমার মধ্যেকার সেই অগ্নিময় জীবাণুকে
দিক্ষিত করব শ্রীধর নামে
…যে একদিন পৃথিবীর যুবকযুবতীদের পাঁজরের নিচে
বসে এক দ্যুতিময় মরণযজ্ঞের দিকে তাদের সমর্পণ করবে

২. ১১. ৮৬

অবচেতন / ০১৩

রতিপূর্ণা নারীর রাত্রি থেকে চুরী হোয়ে গ্যালো
আমার স্বচ্ছ ছুচোখ
এবং প্যান্টে সে নারীর ভালব সার দাগ নিয়ে
আমি ঘুরে বেড়ালাম সমস্ত শহর
এমনকি চিত্রপ্রদর্শণ পর্যন্ত।
বেশ্যার শীতল যোনি ও ম্যানহোলের অন্ধকার মুখ
অসাবধানে পে রয়ে আমি এখন কি করে
সমকামাদের পেচ্ছাপভরা আদালত গৃহে হাজির হব ?

বিশ্বাস করো একদিন জলন্ত সূর্য আমাদের বুকের
ঠিক মাঝখানে অবস্থান করতেন
তখন রমণে ঈশ্বর ছিলেন,
কিশোরার সদ্য আবিষ্কৃত যৌনকেশে ছিলো জলপাই
বনের গন্ধ। এবং তখন আমাকে মধ্যরাতে
আকাশের দিকে তাকিয়ে ভাবতে হোত না
মঙ্গলের রঙ লাল নাকি উজ্জ্বল কমলা।

সমস্ত যুদ্ধক্ষেত্র ভরে গ্যাছে আমাদের মৃতদেহে
অথচ পরাজিত হয়নি কেউ
অন্যদিকে পরমাণু বোমা ও কাগজের পায়রা
আমাদের ব্রেকফাষ্টের প্রথম আচার।

এক উজ্জ্বল অথচ নিভে আসা পৃথিবীর মধ্যে বসে
আমি—অন্ধ, প্লাষ্টিক মানুষদের দেয়াল পেরিয়ে
দেখতে পাচ্ছি গীতা বা বাইবেলের থেকে পবিত্র
সুন্দরীদের জীবন্ত নিতম্বে; অরণ্য পাগল করা ভালবাসার
মাংসল জলছবি এবং
জৈব যৌনতার জন্য মানুষের মোড়কহীন ঋজু
কাতরতা ; সহস্র বছর পর।

আমার চোখদুটিকে ওয়েষ্ট পেপার বক্সে ফেলে
সেই নারী তখন এক কঙ্কালকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে আছে
এবং বিছানা থেকে টপ্ টপ্ কোরে রক্ত পড়ছে···
রক্ত ছড়িয়ে পড়ছে পৃথিবীর সবুজ মানচিত্রে

৩০. ৬. ১৯৮৬

আজ রাত

আজ রাত ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট আছে।
আজ তোমার জরায়ুর আয়নার মুখ দেখবে না আমি।
একান্ত আলোচনায় তিনি আমাকে আজ
সময়ের বিপরীত স্রোতের সূত্র জানাবেন
এবং আমার হৃদয়টি টেবিলের ওপর রেখে তিতি
অনাবিষ্কৃত আলোয় ধুয়ে দেবেন
অশুভ আত্মাদের সংকীর্তন।

আমি তাকে জানাব
শুদ্ধ সময়ের তান্ত্রিক অন্ধকার এখন বিদায় নিয়েছে
শুক্র থেকে। মস্তিষ্কের মধ্যে দিনরাত
গুহামানবীর স্তব্ধ শীৎকার এবং সক্রেটিসের
বিষপানের দৃশ্যটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রতি শতাব্দীর
প্রদর্শণীতে নিঃসঙ্গ প্রলম্বিত রয়েছে।

এক বৈদ্যুর্য্য বিষ। এক প্রমত্ত আগুন নিয়ে
আমি পালাতে চাইছি
শহর ছাড়িয়ে, ভূমি ছাড়িয়ে অরণ্যের রাত্রিতে
আজ রাত ঈশ্বরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য নির্দিষ্ট আছে।

১. ১. ৮৭

গল্প

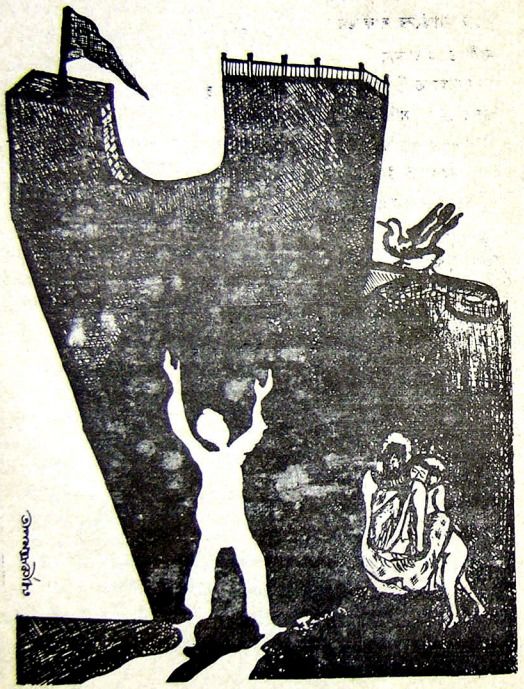

তিনটি নীল আত্মা ও অন্ধকার ঋতু

১.

তিনটি নীল আত্মা সেই নদীর পাশে। তখন ভোর বিকশিত হোচ্ছে। অনির্বচনীয়। এবং ভেসে আসছে মার্গসঙ্গীত, নদীর ওপার থেকে। কোনো এক কুমারী গাইছে সে গান, ব্রহ্মঅচর্ণার মত।

তাঁরা নম্র কুয়াশার নিচে উজল উদাসীন ভাবে দাঁড়িয়ে আছেন। একজন মুখ ফিরিয়ে অন্যদের বলেন 'কাল রাতের নাটকে অনেক রক্ত ছিল, হত্যা ছিল এবং অশুভ অন্ধকারে পূর্ণ ছিলো মঞ্চ···সাজঘরও।' 'আমরা দেখেছি। এরকমই তো হয়। এভাবেই তো প্রস্তুত এই সব চিত্রিক রচনা।' তারা, অন্য দুজন বলেন। সমুদ্রের কেশদাম থেকে উঠে আসছে হিমসিক্ত বাতাস। এখন, এসময় পৃথিবীও অন্যরকম রূপ পায়।

'তুমি ত্যাখোনি ফুলের পাপড়িতে শিশির বিন্দু, হিম। শিহরীত সময়। তার মধ্যে অন্য নাটক ছিল।' অথবা রাজপথে দাঁড়িয়ে নিজস্ব সংলাপ।' দ্বিতীয় আত্মা বলে।

'তবু, শব্দ শুনে বাইরে এসে ছিল একজন যুবক। হঠাৎ এক অন্ধকার জাল তাকে মহাকাশের ব্ল্যাক হোল ট্রাজেডির মধ্যে টেনে নেয়। তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি।' তৃতীয় আত্মা বলে।

২য় ঃ তোমার চিন্তায় এত বেশি ক্যানো—অন্ধকার, ট্রাজেডি ?

১ম ঃ আমি জানি সেক্সপিয়র নামক এক অভিজাত স্রষ্টা চারটি অনুপম ট্রাজেডি রচনা করেছিলেন...

২য় ঃ তুমি প্রায়ই চপল হও। প্রসঙ্গ ; 'অন্ধকারের বর্ণান্তর' তৃতীয় তুমি কোথায় দেখেছ বিভিন্ন স্তর ও বর্ণের অন্ধকারের প্রদর্শণী ?

৩য় ঃ এই পৃথিবীতেই

২য় ঃ আমাদের সময়ে ?

১ম ঃ আমাদের সময় তো ইতিহাসহীন প্রথম মানুষদের অরণ্য ও গুহার দিন থেকে আগামী অজানা বিন্দু পর্যন্ত···

২য় : এত প্রকাশ্য হোয়েও না

৩য় : তুমি তো জানো পম্পাই শহরের শেষ আগ্নেয় রাত্রেও অন্ধকার ছিল।

২য় : মানুষের শরীরে অন্ধকার ঋতু পরিবর্তনের মত আসে, বর্ণময়।

৩য় : এই আদ জীবন্ত অন্ধকারই বোধ, চেতনা, অনুভূতি ও সম্পর্কের পরিকাঠামো।

১ম : এ সময় পৃথিবীর জন্মমুহূর্ত পালিত হয়। এখন মানুষের প্রসঙ্গ পারম্পর্যময় নয়। মানুষ অতিরিক্ত আক্রান্ত হোয়েছে অসুখে। সে অভিশাপাহত। আমি তার কান্না শুনতে পাই।

৩য় : সেটা সৃষ্টির কম্পন। সুর।

১ম : না।

তাঁরা তিনজনই স্থির দাঁড়িয়ে, চিন্তা করেন। দ্বিতীয় আত্মার মনে হয় এত বিপন্নতা তবু এত অগ্রবর্তী একটা সময়েও রাজনীতি ক্ষমতা দখলের প্রাগ্ ঐতিহাসিক যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু হোয়ে উঠতে পারল না। দার্শনিকরাই বা ক্যানো এত তাড়াতাড়ি নিদ্রায় অদৃশ্য হন? তৃতীয় আত্মা ছাখেন ভালবাসার আড়ম্বরহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঢেউ সোনালি রোদ্দুরে হাস্যময় হোয়ে উঠছে। স্রোত আছে। এগিয়ে যাওয়া আছে সামনের দিকে যা কল্পলোক, এখনো অবধি, তবু ভালবাসা—নিরপেক্ষ, নির্লিপ্ত, শাশ্বত। প্রথম আত্মার মনে হয় বৈজ্ঞানিক যে প্রোটনের ধনাত্মক প্রবাহকে দমন কোরে মুক্ত কোরতে চান ঋণাত্মক ইলেকট্রন শক্তিকে—সেই প্রোটনের বিষাদ এখন পৃথিবীর প্রতিটি ঘাস বহন করছে। এখন মেয়েটি ওপারের সেই অজানা কিশোরী, সেই প্রার্থনারই স্বরলিপি অনুসরণ করছে।

৩য় : আমরা বারবার এই নদীর পাশে এসে দাঁড়াই। অথচ আমাদের উদ্দেশ্য ছিল স্রোতের বিপরীত দিকে যাওয়া এবং উৎসমুখের শ্যাওলা ধরা পাথরে মৃত্যুর উল্লাস ছাখা।

১ম : সেই শান্ত, আনমনা, মুহূর্তজ্ঞানী জীবনকে গ্রাস কোরে মৃত্যু কি আনন্দ পায়? মৃত্যু হিংসেবহীন, উদ্ধত, জেদি।

২য় : মৃত্যু এত ক্ষমতাবান নয়। নিজেকে দিয়ে বোঝ না? মৃত্যু এক উন্মাদ যোদ্ধা। একরোখা যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে, খুন কোরছে, ধ্বংস কোরছে অথচ একবারও চোখ ফিরিয়ে দেখছে না তার হাতের রক্ত শুকোবার আগেই তারা জেগে উঠছে, গান গাইছে।

৩য় : মৃত্যু তবু ভয়াবহ, কারণ মিথ্যা, কারণ অন্ধকার।

২য় : বিশ্বের আদি রূপও অন্ধকার। অন্ধকার থেকে আরও অন্ধকারের দিকে যাওয়া যায় বটে সেটা একটা নির্দিষ্ট অবস্থা পর্যন্ত। তারপর আলো।

১ম : সেই সব ব্যর্থ ডিম্বাণু যারা ভাসতে ভাসতে অপেক্ষা করে মিলনের, তারপর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এটা মৃত্যু অথবা ব্যর্থতা—না মিলিত হবার, লক্ষ্যে পৌঁছতে না পারার।

২.

ছবি □

তাঁরা তিনজন জানেন তাঁদের কথা তাঁরাও অনেকসময় বোঝেন না। তাঁরা জ্ঞানী, পূর্ণবয়স্ক, বুদ্ধিমান। তাঁরা শহরের দিকে মুখ ফেরান এখন।

শঙ্করাচার্যের নিদ্রার মধ্যে স্খলিত শক্তি পান কোরে তার এক দাসী অনিন্দসুন্দর গর্ভলাভ করেন। শঙ্কর জানতেন না। সেই দাসী একদিন তার মাতৃত্বের সাংবিধানিক স্বীকৃতি দাবী করে। 'আমি আপনাকে উদরে স্থান দিয়েছি। আমার রক্ত দেহরস ও স্নেহে আপনি বিকশিত হচ্ছেন আমার ভিতরে। আপনি আমার পুত্র।'

শঙ্কর আশ্চর্য হলেন। অপ্রয়োজনীয় মৃত জড় থেকে জেগে উঠেছে জীবন। তাঁর কোন উদ্দেশ্য ছিল না। কিন্তু শরীর থেকে নিক্ষিপ্ত ঐ শুক্রাণুগুলি আপাত ব্যর্থ হোয়েও অস্বাভাবিক, উজ্জ্বল প্রত্যাবর্তনের ধ্যান করত।

শঙ্কর বললেন: কোন আমি সত্য? এই আমি যে কথা বলছে না যে ভ্রূণ পূর্ণতা পাচ্ছে আপনার ভিতরে, সে?

দাসীটি উত্তর দিতে পারেন নি। উত্তর দিতে পারেনি সেই তমসাবৃত রাত। প্রদীপের আলোয় বেদান্তের সিদ্ধান্তের জটিলতায় ডুবে যাবার বদলে তিনি নিষ্পলক বসে রইলেন। 'আমি সত্য নই, সত্য নয় পৃথিবী, সত্য এক—ব্রহ্ম, আর সবই কল্পনা। কিন্তু কল্পনা কি বিভাজিত হয়? কল্পনা কি সৃষ্টি কোরতে পারে নিজের প্রতিরূপ?' তাঁর চোখের সামনে প্রদীপটির শান্ত নীল শিখাটিকেই তিনি দেখতে পান। বাইরের অগ্নিকে নয়। 'জড়ও প্রাণ অর্জন করতে চায়। আমি মিথ্যা বলি সবকিছুকে। মিথ্যা কি? যদি সবই সেই পরম দ্যুতি, তাহলে মিথ্যা যা তাও সেই চিরপ্রণম্য, চিরস্তব্ধ সত্যেরই অংশ।'

বিচলিত আজ শঙ্কর। দাসীটি তৃপ্ত। তার পূর্ণকুটিরে শুয়ে সে আগামী পৃথিবীকে স্তন্যপান করাচ্ছে। সুধাসমুদ্র বন্ধনমুক্ত হোতে চাইছে। ‘প্রভু শঙ্করাচার্য ঈশ্বর, এসবই তাঁর লীলা। সত্যের অতিক্ষুদ্র অংশও সত্য। আমি যদি সত্য নাও হই আমার মধ্যেকার এই জীবন, এই শিশু সত্য।’

শঙ্করাচার্য সমস্ত রাত নিদ্রাহীন থাকার পর এখন ক্লান্তির বদলে অরূপ আনন্দ অনুভব করেন। সত্যের রহস্যময় অন্তরে আরো কিছুটা প্রবেশ করতে পেরেছেন তিনি।

‘তুমি এ ছবি দেখেছিলে। বিস্মৃত হচ্ছ ক্যানো? এইসব উৎকৃষ্ট অনুভূতিগুলিই আমাদের এক একটি বাতিঘর।’ দ্বিতীয় আত্মা গাঢ় স্বরে বলেন। ‘অথচ এতদিনেও মানুষ সেই উপলব্ধ অনুভূতিকে স্পর্শমাত্র করল না। বাতিঘর আলোক জালিয়েই রেখেছে। সেই আলোকে পথ দেখাব লোক হোল না।’ প্রথমের কণ্ঠ আহত, অসহিষ্ণু।

২য়: কেউ তো শহরের বাইরের পা রাখল না! কেউ কেউ দেখতে চাইল না। ব্যবহার করতে চাইল না আলোকে। অক্ষমতা তাদের, মানুষের।

৩য়: ক্ষুদ্রতা তাদের কাছে সব। অংশই সমগ্র বলে প্রতিভাত হোচ্ছে।

২য়: আসলে সবাই তো মুক্তি চায় না।

১ম: মুক্তি!

২য়: জীবন ও বিশ্বের চলমান রূপকথার সুস্থির, চিরসত্য বিশ্লেষণ। তারপর সবকিছু সরল। অজ্ঞানতাই তো ভয়, প্রগতির বাধা। যে সময়কে বিশ্লেষিত করতে পারে সেই মুক্ত।

ছবি □

সেইসব প্রাচীন রোমশ ঘোড়ার দল এখনও উপত্যকায় দল বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তারা এখনও বশ্যতা স্বীকার করেনি। বিশাল পরিবারের সেই প্রধান চরিত্র একটু পৃথুলা, অবসন্ন, দুপুরে গুহার বাইরে পাথরের গায়ে ঠেশ দিয়ে সেই ঘোড়াদের ভ্যাখে। তার পূর্ণবয়স্ক পুত্রেরা, কর্মঠ স্বামীরা, এবং তার কন্যারা অরণ্য ও নদীতে যুদ্ধ করছে, খেলছে, জীবন সংগ্রহ করছে, তাদের ফিরে আসতে এখনও দেরী। সে বুক ও কোমর থেকে পাতার আবরণ সরিয়ে রাখে। একটু রোদ আসুক। রোদ্দুর একটু নিরাকার আদর করুক তাকে। তার শরীরে একদিন

তার সদ্যকিশোর পৌত্র বেড়াতে এসেছিল রহস্য ও রূপে অন্ধ হোয়ে। সে দুহাত ও সমগ্র ইচ্ছা দিয়ে তাকে, সেই কিশোরকে সেই অজানা দেশে বরণ করেছিল। এ তার পবিত্র কর্তব্য।—রহস্য উন্মোচিত কোরে পৃথিবীর জমাট অশ্রুকে হাল্কা করার। এখন সেই—চিরন্তন নারী অথবা মা সেই কিশোরের স্বপ্নকে উদরে ধারণ কোরে তৃপ্ত, অলস বসে আছে পা ছড়িয়ে।

প্রথম আত্মার চোখে এই ছবি অতি সবুজ, সত্য, পবিত্র। সে তা অন্যদের স্মরণ করায়।

‘সৃষ্টির আনন্দ নিজেই সমগ্র জগৎ। বিশ্লেষিত নিজ উষ্ণতাতেই। সেই প্রথম সকালের যে ছবি, তুমি দ্যাখালে তা সম্পূর্ণ, ঈশ্বরের শুভেচ্ছা। উপসনাগৃহে একমাত্র সেই নারী, সেই মা-এর মূর্তিই থাকতে পারে।’ দ্বিতীয় জন আপ্লুত প্রেম-সিক্ত কণ্ঠে বলে।

‘কোন ধর্মের উপসনাগৃহে?’ তৃতীয় আত্মা বলে।

‘ধর্ম একটাই। কিছু অপরিণামদর্শী অর্বাচিন ধর্মকে খণ্ডিত কোরছে। তারা মূঢ়, দাম্ভিক। ধর্ম শাশ্বত—রক্ত ও সংস্কারের মধ্যে মিশে থাকা অদৃশ্য জ্ঞানানু।’ প্রথমের কণ্ঠে অপার বিশ্বাস।

সেই মাতৃমূর্তি। যিনি রক্ত মাংসের, জীবন্তভূতির তিনি যৌনতকার হন। পুরুষকে কল্পলোকের অমৃতভাণ্ডের কাছে নিয়ে জান, শীৎকার করেন, ভ্রুণকে লালিত করেন নীল সীমাহীন আকাশের মত। প্রসব যন্ত্রণায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন হোতে হোতে হাসেন ভোরের মত ··সেই শিশুর হাত ধরে তিনি শেখান কিভাবে বন্য রোমশ ঘোড়াগুলির গলায় ফাঁস আটকে দিতে হয়, কিভাবে ঘ্রাণ নিতে হয় ফুলের, কিভাবে সময়কে ধরে রাখতে হয় গুহার দেয়ালে···এবং কিভাবে হাতের অস্ত্রটি আক্রমনকারী পশুর বুকের মাঝখানে প্রবেশ করাতে হয়।

দ্বিতীয়ের কথা শেষ হোতে তৃতীয় বলেন ‘জানি আমি। এই ছবিও বিবর্ণ হয়। আমি বারবার দেখেছি। হ্যামলেটের মা—গার্টুড অথবা কুন্তি—মহাভারতের।’ প্রথম বলেন ‘সে সব ঝড় ও বৃষ্টির উৎক্ষিপ্ত রাত্রি। সিংহাসন ও যুদ্ধ বিপর্যস্ত করে আমাদের, শেষতম জনগণকেও। তাতে নক্ষত্রগুলি ঝাপসা হোয়ে যায় না।’

তারা হাঁটতে হাঁটতে শহরের মধ্যে আসেন। এখনও সম্পূর্ণ সুপ্তি ভাঙেনি। এখনও পার্কগুলি ভরে ওঠেনি বেকার, ভিক্ষুক, ভাগ্যান্বেষী, ম্যাজিকওলাদের ভিড়ে। ট্রামের চলার শব্দে আড়মোড়া ভেঙে উঠে দাড়াচ্ছে সদ্য রঙ চিনতে শেখা শিশু। তার মা গত রাত্রে অন্য এক পুরুষের সঙ্গে রঙিন ফানুস ওড়া মেলার দিকে

চলে গ্যাছে—সে জানেনা। সুসজ্জিত হোটেলে সামনে দাঁড় করানো একটি বিদেশজাত গাড়ীর গায়ে সে পেচ্ছাপ করতে করতে বিজয় স্তম্ভের দিকে চেয়ে থাকে। সেই তিনজন পাশাপাশি হাঁটতে থাকে।

৩.

রক্তাক্ত মৃত যোদ্ধারা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াচ্ছে। গোপন সেলারের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছেন হিটলার। তিনি আত্মহত্যা করেননি। বহু যুবককে তিনি আত্মহত্যার নেশা ধরিয়েছিলেন। জেশাস ক্রাইস্টের রেসারেকশান কখনে সম্পূর্ণ হয়নি। তিনি কাঁটার ক্ষত বা প্রসাধনগুলি মুছে ফেলছেন। এখন এককাপ কফি খাবেন তিনি এবং ইয়াসের আরাফতের সঙ্গে প্যালেষ্টাইনের সমস্যা নিয়ে দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় বসবেন। ঘরের বাইরে সেইসব তেজোদীপ্ত দৃঢ় আদর্শবান গেরিলারা মেশিনগান হাতে অপেক্ষা করছে। অপেক্ষা করছে প্যালেষ্টাইনের উষর প্রকৃতি ও দাঁতে দাঁত চেপে রিক্ত শিশুরা।

এই মঞ্চে গত কয়েক শতাব্দী ধরে বহু নাটক অনুষ্ঠিত হোয়েছে। সবই যুদ্ধের, ভীষণ হিংসার। দর্শকরা দেখতে পায়নি কালো পর্দার ওপাশে মঞ্চের ওপর থেকে রক্ত ধুয়ে ফেলছে যারা তারা সবাই মৃত। এত রক্ত তা নাহলে ছাথা সম্ভব নয়। এই মঞ্চে কেউ নাচে না, কেউ গান করেনা। যারা মৃত্যু দেখতে অভ্যস্ত তারা সহ্য করতে পারেনা প্রজাপতির ডানার রঙ। আর গান শুরু হেলেও কালো শীর্ণ হাতগুলি ভাঙা এনামেলের পাত্র বাড়িয়ে এগিয়ে আসে। সেইসব পাত্র ভরাট হয়না কিছুতেই···একমাত্র গ্যালিলিওর হতাশা ছাড়া।

১ম : মানুষ তো অন্ধ নয়!

২য় : মানুষ চিন্তা কোরতে পারে।

৩য় : মানুষের বুকের মধ্যে সর্বশক্তিমান অগ্নি আছে।

১ম : তবু পরাধীন সে। তার চোখের সামনে একটি ভারী পর্দা সর্বক্ষণ।

২য় : তার স্বপ্নের পরিধিও সঙ্কুচিত হোয়েছে।

৩য় : সত্যের প্রতি আকর্ষণ হারিয়েছে সে।

তারা বিষণ্ণ বোধ করেন। এত দ্রুত ফুলগুলি শুকিয়ে যাচ্ছে ক্যানো? অরণ্য নয় তারা মরুভূমির এগিয়ে আসার শব্দ পান। দ্রোপদীকে নিরাভরণ করা যায়

না তাঁরা জানেন, তবু আশঙ্কা হয়। নগ্ন চাঁদের আলোয় তারা দেখেছেন বহু প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ। তাঁদের চোখে পড়েছিল ম্যারি আঁতোয়নেতের স্নানঘরের জানলা দিয়ে চলকে পড়া আলো। ইহুদি উৎসবে ঝলসানো হোয়েছিল মানুষের মস্তিষ্ক।

'আজকাল মানুষ নিজেকে রহস্যময় নিজের ছায়া ভাবে। সমস্ত সভ্যতা, সংস্কৃতি, রক্তক্ষয় সবই কেমন প্রাণহীন, প্রাণহীন মহড়া। অভিনয়। এক সামগ্রিক অভিনয়। মহামারী সবাইকে অন্ধ কোরেছে।'

তৃতীয় আত্মা বলেন।

দ্বিতীয় জন : অভিনেতা সবাই! এরা কি সচেতন? দর্শক কারা এই অভিনয়ের?

প্রথম জন : ম্যাকবেথের সেই তিন প্রাচীন ডাইনি। তারা বিকৃত স্বরে হাসে। লৌহকটাহে রান্না হয় কল্পনা, ভালবাসা। খুব অন্ধকার। জানো খুব অন্ধকার চারপাশে। শুধু সেই বুড়িদের চোখগুলো জ্বলে।

তারা যে পার্কে বসেছিল সেখানে দুজন তরুণ-তরুণী এসে বসে। দূরত্ব রেখে। নরম রোদ্দুরে তাদের সিগারেটের বিজ্ঞাপনের আদর্শ যুগলের মত মনে হয়। কিন্তু বিষণ্ণ তাদের চোখ।

তরুণ : আমার বিছানার নিচে অন্ধকার, পড়ার টেবিলে অন্ধকার, অন্ধকার জলের গেলাসে···

তরুণী : আমারও। সমস্ত ঘর জমাট অন্ধকারে পরিপূর্ণ। কেমন অতিনীল শুষ্ক অন্ধকার।

তরুণ : আমি আয়নায় কিছু দেখতে পাইনা। সে কেবল বর্ণময় অন্ধকার প্রতিফলিত করে।

তরুণী : আমিও কতদিন নিজের মুখ দেখিনি।

তরুণ : আমি কথা বলছি···আসলে অন্ধকার বেরিয়ে আসছে ঘন ধোঁয়ার মত। দেখতে পাচ্ছ না!

তরুণী : পাচ্ছি। আমারও তাই হয়। এই মুহূর্তেই হোচ্ছে।

তরুণ : আমি পরিত্রাণ চাই।

তরুণী : চলো আমরা দূরে···অনেক দূরে চলে যাই···

তরুণ : আমার ভয় হয় অন্ধকার কোন স্থানকেই কুমারী রাখেনি।

তারা তিনজন কথা বলতে পারে না এই দুজনকে দেখে। তারা নদীর দিকে ফিরে যাবার সিদ্ধান্ত করে।

১ম : ঐ নদীর সামনে কেউ যায় না ক্যানো ?

২য় : কিন্তু সত্য কোনটি ? এই চরাচরবিস্তৃত অন্ধকার না ঐ দুজন যারা অন্ধকারকে ঘৃণা করে ?

৩য় : আমরা হয়ত নদীতেও রক্তস্রোত দেখব।

একটু পরে আবার মঞ্চ থেকে পর্দা উঠবে। দর্শকরা লাইন দিয়ে টিকিট কিনছে। অনেক দিন বৃষ্টি হয়না। যারা একটু পরে অন্ধকার হলে বসে নাটক দেখবে তারা বহু বছর সবুজ পাতার উপর বৃষ্টি পড়ার শব্দ শোনে নি। নাটক জমে উঠবে তবু। এ নাটকে দর্শকরা অভিনেতা হন, অভিনেতারা দর্শক। অন্ধকারে ডুবে যায় কোমর পর্যন্ত অন্ধকার প্রবেশ করে সিগারেটে। এবং আধো অন্ধকারে মঞ্চে একের পর এক অদ্ভুত মূর্তিগুলি আদিম উল্লাসে নেচে যায়।

শহর পরিক্রমা শেষ হোলে তারা অন্যত্র চলে যেতে চান। তাদের হৃদয় ভরাক্রান্ত। ইতিহাসের অজস্র স্মৃতিও গন্ধ তাদের হাতব্যাগে ঘুমিয়ে থাকে। তারা উড়তে গিয়ে ছাখেন তাদের পায়ের নিচে চটচটে তরল অন্ধকার। তারা একে অপরের মুখের দিকে চান। প্রত্যেকের মুখে কাল মানচিত্র।

তখন দূরে সেই পার্কে সেই তরুণ-তরুণী বৈদিক মন্ত্রের মত সম্পূর্ণ। আলিঙ্গনাবদ্ধ। অন্ধকার মিশে যাচ্ছে অন্ধকারে। এক অন্ধকার হারিয়ে যাচ্ছে আর এক অন্ধকারের মধ্যে।

তিন নীল আত্মা তীব্র ব্যথায় আক্রান্ত হন। তাঁরা কাঁদতেও ভয় পান। অশ্রুর বদলে তাদের চোখ দিয়ে অন্ধকার নেমে আসতে পারে।

নিরোর বেহালা

শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ

আপনার প্রগতিশীল চেতনার

জন্য একমাত্র নিবেদন

ছ'টাকার বিনিময়

একটি অনার্য সাহিত্য প্রকাশ

ভিতরের ছবির ১, ২, ৩ নং শ্রীধর মুখোপাধ্যায়ের এবং ৪ ও ৫ নং তাপস চক্রবর্তীর।

অনার্য সাহিত্য / ৬

যোগাযোগের ঠিকানা :

অনার্য সাহিত্য

৮, সৃষ্টিধর দত্ত লেন

কলকাতা-৭০০ ০০৬

সম্পাদক কর্তৃক প্রকাশিত ও তৎকর্তৃক মিন্ট প্রিন্টার্স, ১১২ রাজা রামমোহন সরণী, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত।

Rs 3.00